ছাত্র সমাচার

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬

- মুহতারাম আমীরের লিখিত বক্তব্য
- গুলশান ও শোলাকিয়া হামলা
- স্বাধীনতা যে জনপদে পথ ভুলে যায়
- রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্রঃ দেশের জন্য ক্ষতিকর উন্নয়ন প্রকল্প
- দেশে-দেশে সহিংসতা আদর্শিক না সন্ত্রাস

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
নূরুল ইসলাম আল-আমীন

সম্পাদক
শেখ ফজলুল করীম মারুফ

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

শুভেচ্ছা মূল্য
পনের টাকা

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
ছাত্র সমাচার
৫৫/বি পুরানা পল্টন (৩য় তলা) ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৫৭১৩১, ০১৯৬৬১১০৮৩৩
e-mail : chhatrasomachar@gmail.com
www.iscabd.com

সম্পাদকীয়



সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব আজকের বিশ্বের সব চেয়ে বড় বাস্তবতা। যার বিভৎস বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখলাম কাশ্মীরে হাজারো মানুষকে ছররা গুলিতে পঙ্গু করা হলো। হাজার হাজার তরুণকে অন্ধত্বের অভিশাপ বরণে বাধ্য করা হলো। -৮৫ এর অধিক মানুষকে হত্যা করা হলো। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো ১৮ জন হানাদার নিহত হওয়ার ঘটনা। বিশ্ব মিডিয়া ও বিশ্ব রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো ১৮ ভারতীয় সেনা নিহত হওয়ার ঘটনা। আড়াল হয়ে গেলো কাশ্মিরের স্বাধীনতার দাবি। মানবতার সাথে এই নির্মম পরিহাসের পেছনে সক্রিয় কারণ এই সভ্যতার সংঘাত। কাশ্মীরিরা মুসলমান, আর মুসলমান মাত্রই পশ্চিমা খ্রিস্টান আর উপমহাদেশের হিন্দুত্ববাদী সভ্যতার নোংরামির বিরোধিতাকারী। তাই এ সব শক্তি ইসলামকে তাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি বলে মনে করে। ফলে ইসলামী সভ্যতা আর পশ্চিমা ও হিন্দুত্ববাদী সভ্যতার মাঝে সংঘাত অবধারিত হয়ে পড়েছে। দুঃখজনক ভাবে এই সংঘাতে আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি না থাকায় আমারা বারংবার পশ্চিমা ও হিন্দুত্ববাদী শক্তির কাছে পরাভুত হচ্ছি। এখনো যদি আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত না করি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ইসলামী সভ্যতাই অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। সভ্যতার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে প্রথমত আমাদের প্রয়োজন জ্ঞানগত দক্ষতা। ইসলামী জ্ঞানে দক্ষতার পাশাপাশি সামাজিক জ্ঞানেও দক্ষতা। পশ্চিমা ও হিন্দুত্ববাদী সভ্যতার রাষ্ট্র অর্থনীতি, সমাজনীতি, সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শিতা। ওরা যেসব ভাষা-পরিভাষা ব্যবহার করে সমাজকে ব্যাখ্যা করে আমাদেরকেও তা জানতে হবে। ওদের মোকাবিলায় পাল্টা তত্ত্ব আবিস্কার করতে হবে এই সংঘাতে টিকে থাকতে হলে ঐক্যের কোন বিকল্প নাই। ঐক্য বলতে সব দল আদর্শ ও নীতিগতভাবে এক দলে পরিণত হওয়া বোঝায়।

এখানে কোন জোটগঠন করার কথা বলা হচ্ছে না; বরং মানসিক ঐক্য ও চিন্তার ঐক্য গঠন করা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ মূলক মনোভাব ত্যাগ করা, নিজেরা নিজেদের মধ্যে রাজনীতি করা, কাদা ছোঁড়াছুড়ি করা ত্যাগ করতে হবে প্রশ্ন হলো– নিজেরা বলতে কী বোঝায়? সংঘাত যেহেতু ইসলাম বনাম হিন্দুত্ববাদী ও খ্রিস্টিয় শক্তির মাঝে, সেহেতু এখানে নিজেরা মানে তারা যাদেরকে ইসলামের অনুসারী বলে চিহ্নিত করা হয়। হ্যাঁ, ইসলামের অনুসারীদের মাঝে নানা বিভেদ বা মতপার্থক্য থাকতে পারে– কিন্তু যাদেরকেই মুসলমান বলে চিহ্নিত করা হয় তারা সবাই মিলেই আমরা। তাই, আমাদের সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা ইসলাম অনুসারীদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন।

কুরআন থেকে

আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা কর

মুফতি আবদুর রহমান গিলমান

সুরা ফাতিহার ষষ্ঠ আয়াতটি হল– "ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম"। অর্থাৎ- তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা কর। হিদায়াত অর্থ পথ প্রদর্শন করা। হিদায়াতের কয়েকটি স্তর রয়েছে। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা এই স্তরসমূহ প্রমাণিত। হিদায়াথের প্রথম স্তর সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড় প্রদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতও এর অন্তর্ভুক্ত।এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- 'তিনি প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হিদায়াত দান করেছেন।' অর্থাৎ তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস ও বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। আর সে অভ্যাস ও দায়িত্বানুযায়ী হিদায়াত দান করেছেন। এই হিদায়াতের কারণে সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুই নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে।

হিদায়াতের দ্বিতীয় স্তর প্রথমটির তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। এই হিদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য- যারা বিবেকবান ও বুদ্ধিসম্পন্ন। অর্থাৎ মানুষ এবং জিন জাতি। এই হিদায়াত নবী রাসুল এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ তা গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফের বেঈমানে পরিণত হয়েছে।

হিদায়াতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মুমিন ও মুত্তাকিদের জন্য। এই হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তাওফিক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, এর ফলে কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। -মাআরিফুল কুরআন, মুফতি শফি রহ. (সংক্ষেপিত)

সিরাত মানে পথ। আর মুসতাকিম মানে সঠিক। সঠিক পথের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন- যে পথের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকে তাকে সঠিক পথ বলে। এক. সোজা হওয়া। আঁকাবাঁকা না হওয়া। দুই. প্রশস্ত হওয়া। তিন. এই পথে গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হওয়া। চার. গন্তব্য নিকটবর্তী হওয়া এবং পাঁচ. গন্তব্যে পৌঁছতে এ পথ ব্যতীত বিকল্প পথ না থাকা। সিরাতে মুসতাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য দীন ইসলাম। আর এর মাঝে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। -মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলভী রহ.।

সিরাতে মুসতাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য দীন ইসলাম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. প্রমুখ সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া রহ. বলেন- এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার ঐ দীন যা ব্যতীত অন্য কিছু তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

সরল পথ মানে সব কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং যেকোন ধরনের বাড়াবাড়ি বর্জন। অনেকে মূলনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির স্বীকার হয় এবং অনেকে কর্মক্ষেত্রে ও নৈতিক ক্ষেত্রে ভুল পথে চলে যায়। অনেকে আবার সব কাজের জন্য আল্লাহকে দায়ী করে; যেন পরিণতির ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। কেউ আবার সব কাজে নিজের ক্ষমতাকে চূড়ান্ত মনে করে যেন সৃষ্টি জগতের কাজ-কর্মে আল্লাহর কোন হাত নেই। অনেক কাফের আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ নবী-রাসুলদেরকে সাধারণ মানুষ এমনকি পাগল বলেও আখ্যায়িত করেছিল। অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তি আবার হজরত ঈসা আ.-এর মতো নবীকে খোদার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের চিন্তা ও আচরণের অর্থ হল রাসুল এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে আর্থ-সামাজিক কাজ-কর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন সুরা আ'রাফের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'তোমরা খাও এবং পান করো। তবে অপব্যয় করো না।' সুরা আসরা বা বনী ইসরাইলের ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'নামাজে স্বর উঁচুও করো না আবার অতিশয় ক্ষীণও করো না। বরং এ দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। একইভাবে সুরা ফুরকানের ৬৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'মুমিন ব্যক্তিরা যখন দান করে তখন তারা অপব্যয় করে না আবার কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এ দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।' ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো।' আবার সেখানে এও বলা হয়েছে যে, 'তারা যদি তোমাকে মিথ্যা পথে পরিচালিত করতে চায় তবে তাদের আনুগত্য করবে না।' যারা কেবল সমাজ থেকে বেরিয়ে একাকি এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয় কিংবা শুধু মানবসেবাকে ইবাদত বলে, তাদের ধারনার জবাবে পবিত্র কুরআন নামাজ ও জাকাতকে পাশাপাশি বর্ণনা দিয়ে বলেছে, 'তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর।' সর্বোপরী সিরাতে মুসতাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন মধ্যম পথ- যা সীমা অতিক্রম এবং মর্জি মতো কাটছাট করে নেওয়া থেকে মুক্ত।

সারকথা, মানুষের জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন পথ রয়েছে। ব্যক্তি তার নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পথ বেছে নিতে পারে। সমাজ ও জনগণের চলার পথ, পূর্বপুরুষদের অনুসৃত পথ, জনগণের জন্য অত্যাচারী শাসক ও তাগুতী শক্তির পক্ষ থেকে নির্ধারিত পথ। একটি পথ হল দুনিয়ার যাবতীয় রং, রূপ ও সৌন্দর্য উপভোগ করা। আবার অন্য একটি পথ হল সমাজ জীবন থেকে বেরিয়ে একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা বেছে নেয়া। এত সব পথের মধ্যে সঠিক পথ বেছে নেয়ার জন্য মানুষের কি পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন নেই? আল্লাহ পাক মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী রাসুল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন। তাই মানুষ যদি পবিত্র কুরআন, রাসুল সা.-এর অনুসরণ করে তাহলে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তাইতো আমরা প্রত্যেক নামাজে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদেরকে সরল, সঠিক পথে পরিচালিত করেন। যে পথে কোন ক্ষতি ও বিভ্রান্তি নেই, তিনি যাতে ঐ পথে আমাদেরকে পরিচালিত করেন।

(সাবেক সহ-সভাপতি ইশা ছাত্র আন্দোলন)

হাদীস থেকে

বিষয়: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অগ্নিপরীক্ষা

বাংলা অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান (তবে বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার শর্তে) আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, আর এ বিপদ ও পরীক্ষায় যারা আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী শরীফ)

রাবী পরিচিতি:

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. এর উপনাম ছিল আবু হামযা, আবু উমাইয়া, আবু উমামা এবং আবু উমায়মা। তার উপাধি ছিল "খাদেমুর-রাসূল" সা.। পিতার নাম, মালেক, মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মেলহান রা.। মাত্র দশ বছর বয়সে তার মাতা তাকে রাসূলে আরাবী সা. এর খেদমতে পেশ করেন। পরবর্তী দশ বছর তিনি খাদেমুর-রাসূল হিসেবে তার সাহচর্যে অতিবাহিত করেন।

এটা হযরত আনাস রা. এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক অপার দয়া। আর কোন সাহাবী এত অধিক সময় আল্লাহর রাসূল সা. এর খেদমতের সুযোগ প্রাপ্ত হননি। বয়সের স্বল্পতাবশত তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে পরেননি। তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। হযরত আবু বকর রা. এর খেলাফত কালে তিনি বাহরাইনের আমেল ও গভর্নর নিযুক্ত হন।

হযরত ওমর রা.এর শাসন কালে তিনি বসরার মুফতির দায়িত্ব পালন করেন। **বসরার জনসধারণকে**

তিনি ইলমে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের তালিম দিতেন।

হযরত আনাস রা. ছিলেন হাদীসের একনিষ্ঠ খাদেম। আল্লামা আইনী রহ. এর মতে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা (১২৮৬) এক হাজার দুইশত ছিয়াশি। তবে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সনদে যৌথভাবে (১৬৮) একশত আটষট্টি খানা হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। হযরত আনাস রা. এর মাতা উম্মে সুলাইম রা. রাসূলে করীম সা. এর নিকট ছেলের ধন-সম্পদ সন্তানাদি, দীর্ঘ হায়াত ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বললে তিনি দু'আ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ দু'আর বরকতে তাঁকে দীর্ঘ হায়াত, বহুসম্পদ ও দু'কন্যাসহ ১০০ সন্তানের জনক করেছিলেন।

হযরত আনাস রা. ১১০ বছর বয়সে বসরা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। তার থেকে ইমাম যুহরী কাতাদা, ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি:- জামেআত-তিরমিযী গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাতা ইবনে মুসাআত-তিরমিযী। তিনি জীহুন নদীর তীরের তিবমিয় নামক শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের হিফ্জ সমাপন করেন। অতপর তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য কুফা, বসরা, খুরাসান, ইরাক ও হিজাজের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তির অধিকারী এ মহান পুরুষ ইমাম বুখারী রহ. এর স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন। হাদীস গ্রন্থ রচনায় তিনি ভাষা পন্ডিত্য, সংকলনের কলাকৌশল, মাসয়ালা-মাসায়েলের বিন্যাসে এক অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যাকে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় জামে বলে।

হাদীসের ব্যাখ্যা:

চিরন্তন কালের পরিক্রমায় আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে নবীরাসূলগণকে পরীক্ষা করেছেন, উত্তীর্ণকে পুরস্কৃত করেছেন অনুত্তীর্ণকে করেছেন ক্ষমা(আল্লাহকে রব মেনে অনুতাপের শর্তে)। আলোচ্য হাদীসে রাসূলে আরাবী সা.দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত আল্লাহর বান্দাদের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই এ পরীক্ষার সূচনা। বান্দাকে খলিফাতুল্লাহ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠানোর প্রারম্ভিক কার্যক্রম শুরু হলো এবং পরীক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালা তার সূচনা করলেন।

ইন্নিজাইলুন ফিল আরদি খালিফা– এ আয়াত প্রমাণ করে হযরত আদম আ. কে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিই করেছেন দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে। তদুপরি আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে রেখেই তার বান্দা-বান্দিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। ঘোষণা করলেন (ওলা-তাকরবা হাজিহিস সাজারতা ফাতাকুনা মিনাজজোলিমিন) তোমরা এই বৃক্ষটির নিকটবর্তীও হবে না। অতপর যদি তোমরা তার নিকটবর্তী হও তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" এ পরীক্ষায় হযরত আদম ও হাওয়া আ. শয়তানের ধোঁকায় পড়লেন। তবে তিনি পরম সফলতার স্বাক্ষর রাখলেন আপন

কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতাপ প্রকাশে, আপন ভুলের স্বীকারোক্তিতে শত মুসিবতে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জো থাকায়। আপন দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি, নব সুন্দর জীবন, উষর মরুময় পৃথিবীতে আপন সঙ্গিনীকে ফিরে পাওয়া, ভবিষ্যতের জীবন কোন ক্ষেত্রের এক আল্লাহ বিহীন কারও প্রতি আশা বা ভরসা প্রকাশ করেননি। ফলে এ অকৃতকার্যতাকে কৃতকাযর্তার চেয়েও বেশি সম্মানিত করেছে বারে এলাহির দরবারে। আজ তিনি আমাদের আদিপিতা। আর শয়তান–লানাতুল্লাহ।

আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন নূহ আ. কে। হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর নিজেকে দ্বীনের জন্য আগুনে সমর্পণ, সন্তান কুরবানিসহ কত শত পরীক্ষা নেমে এসেছে। মুসা আ. মোকাবেলা করেছেন ফেরাউনের মতো এক অবাধ্য যালিমকে যে ছিল নিজেকে খোদা বলে দাবি করা প্রবল পরাক্রম বাদশাহ।

পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন আপন অবাধ্য কওমকে নিয়েও। হযরত সুলাইমান আ. মুকাবেলা করেছেন অবাধ্য জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়ের ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

■ বিশেষ কলাম

ইসলামী শাসনতহন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর
২৫ বছর পুর্তি উপলক্ষে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর
মুহতারাম আমীর

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম

[পীর সাহেব চরমোনাই] -এর লিখিত বক্তব্য

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই পুনর্মিলনী সমাবেশের সভাপতি, আমন্ত্রিত দেশ-বিদেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, উপস্থিত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর সাবেক-বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং সারাদেশ থেকে আগত ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর সর্বস্তরের সাবেক-বর্তমান সদস্য ও দায়িত্বশীলবৃন্দ। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ ২০১৬ সালে এসে এর ২৫ বছর পূর্তি হলো। ২৫ বছর পূর্তির এই শুভক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি স্মরণ করছি সেসব মহামানবদেরকে যাদের ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে মানবতার ধর্ম ইসলামকে আমরা অবিকৃত অবস্থায় পেয়েছি। স্মরণ করছি সেসব ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম, দার্শনিক, মুজাদ্দিদগণকে যারা ইসলামী জ্ঞানকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং ইসলামকে সমসাময়িক সমস্যার মোকাবেলায় কার্যকর সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

মাগফেরাত এবং জান্নাতে উঁচু মাকাম কামনা করছি সেই সব নাম না জানা বিপ্লবীদের, যারা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ করে বিশ্বের দিকে দিকে ইসলাম ও মানবতা রক্ষার সংগ্রামে শাহাদাত বরণ করেছেন।

স্মরণ করছি ১৭৫৭ সাল থেকে বাংলার মুক্তিসংগ্রামে রক্ত ঘাম-সময় ব্যয় করা মুক্তিসংগ্রামীদের। বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের।

যাদের রক্ত এবং জীবনের বিনিময়ে আজ আমরা একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি।

কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের শহীদ ভাইদের– যারা নিজেদের জীবনের বিনিময়েএদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভীত রচনা করেছেন।

সংগ্রামী ভাই ও বন্ধুগণ!

আপনারা এই ভূখণ্ডের ইতিহাস জানেন। এই ভূখণ্ডের মানুষের ইতিহাস বঞ্চনা, প্রতারণা আর হতাশার ইতিহাস। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে যার সূচনা হয়েছিলো। ১৯৭১ হয়ে সে ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। ১৭৫৭ সালে আমাদের পতনের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলেও ইসলামী সভ্যতার পতনের সূচনা আরো আগেই হয়েছিলো। ১৭ শতকে পশ্চিমা বিশ্ব যখন বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিস্ময়কর সব আবিষ্কার করছিলো, তখন মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ ভোগ আর তামাশায় মত্ত ছিলো। মুসলিমরা সামরিক শক্তি আর আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার চেয়ে নিজেদের মাঝে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলো।

অন্যদিকে গোটা উম্মতে মুসলিমা তাদের কর্তব্য-আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি, তাকওয়া পরহেজগারী ভুলে গিয়ে অন্তর্কলহে লিপ্ত ছিলো। তারা একাধারে যেমন দুনিয়ার হালহাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তেমনি আখেরাতের সম্বল অর্জনেও ছিলো গাফেল। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ১৯ শতকের প্রথমার্ধে বিগত দেড় হাজার বছরের শাসক মুসলিম জাতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরাজিত ও পরাধীন জাতিতে পরিণত হলো।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো, এই পরাজয় কেবল সামরিক পরাজয়ই ছিলো না; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, আদব-কায়দা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাওহিদ-রেসালাত সব কিছুতেই আমরা পরাজিত ছিলাম। আমাদের না ছিলো দুনিয়া বিবস্তুগত সক্ষমতা, না ছিলো আধ্যাত্মিক কোন শক্তি সামর্থ।

ভাইয়েরা আমার!

আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল ইসলাম।

ইসলামের এই পরাজিত অবস্থা এবং মুসলামানদের হীনমন্য অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। অল্প সময়ের ব্যবধানেই মুসলমানরা ইসলামকে কেন্দ্র করে মুক্তি সংগ্রামে শামিল হয়েছে। আমাদের ভারত উপমহাদেশে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে ইসলামই ছিলো প্রধান প্রেরণা। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা ছিলো সম্পূর্ণই ইসলামকেন্দ্রিক। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো– পাকিস্তানী তৎকালীন শাসকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলাম অনুসরণ করে নাই। তারা নিজেদের হীন স্বার্থ হাসিলে ইসলামকে ব্যবহার করেছে। সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হলো, পাকিস্তানীদের অপশাসনের বিরুদ্ধে গঠিত আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে তারা ইসলাম রক্ষার কথা বলে দমন করার চেষ্টা করেছে।

আফসোসের বিষয় হলো, তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে তেমন কোন কার্যকর শক্তিশালী ইসলামী দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তি দেখা যায়নি– যারা ইসলামের অপব্যবহারে পাকিস্তানীদের অপকৌশলকে প্রতিরোধ করে বাংলার মানুষের মুক্তি সংগামের কেন্দ্রবিন্দুতে ইসলামকে নিয়ে আসবে।

এর সুযোগ গ্রহণ করেছে ব্রিটিশদের শিক্ষায় শিক্ষিত পশ্চিমা মানসিকতার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী। তারা পাকিস্তানী শাসকদের অপশাসনকে ইসলামের অপশাসন বলে প্রচার করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে ইসলামের ব্যর্থতা বলে প্রচার করেছে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানীদের অত্যাচার অবিচারে অতিষ্ঠজনতা ১৯৭১-এ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

সংগ্রামী ভাই ও বন্ধুগণ!

৭১ পরবর্তী সময়েও আমরা রাষ্ট্র পরিচালনায় ইনসাফ, সুবিচার ও সুশাসন পায় নি। নীতি-নৈতিকতাহীন সমাজ, বস্তুতান্ত্রিক সফলতার চিন্তায় বিভোর মানুষ বল্গাহীন দুর্নীতি, হত্যা, পাপাচার, দুরাচারে লিপ্ত হয়। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাকে লুণ্ঠনের অধিকার মনে করে।

রাজনীতিকে সেবা নয়; বরং শোষনের হাতিয়ার বানায়। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতগণ মসজিদ-মাদরাসার সীমিত সীমানায় নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে।

জাতি যেন এক ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ছুটে চলে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলার মুজাদ্দিদ, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক রাহবার মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, ইসলামের সুমহান চরিত্রকে জনতার মন-মানসে ফিরিয়ে আনার জন্যে। ইসলামী নীতি-নৈতিকতার শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্মাদনাকে রোধ করার জন্যে। ইসলামের সুসম অর্থনীতি, ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রনীতি, ইসলামের সুশীতল সমাজনীতির মাধ্যমে মুক্তিপাগল বাঙ্গালি মুসলিম জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নস্বাধ পূরণ করার জন্যে।

ইশা আন্দোলন তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করতে গিয়ে অনুধাবন করে-

জাতির অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষকে বৈষয়িক শিক্ষা দেওয়া হলেও নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলে এই শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী স্বার্থপর, সম্পদলোভী হিংস্র হয়ে ওঠে।

বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা-শিক্ষার্থীদের চলমান রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কে শিক্ষা দিলেও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অজ্ঞ থেকে যায়। ফলে তারা মুসলিম বাঙ্গালি সমাজের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অদক্ষতার পরিচয় দেয়।

অপরদিকে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা ইসলামের শিক্ষা অর্জন করলেও চলমান জ্ঞানের অভাবে ইসলামকে সমাজে প্রয়োগ করতে পারছে না। ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজ নেতৃত্বশূন্যই থেকে যাচ্ছে।

আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, বৃটিশপ্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করে লাখো মুসলমানের সন্তান আচার-আচরণে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চিমাদের গোলাম হয়ে যাচ্ছে।

ভয়ংকর বিষয় হলো, এদের আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তারা নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

৯২ ভাগ মুসলমানের দেশ থেকে এই শিক্ষার ফলে সুন্নতের চিহ্ন উঠে যাচ্ছে। শেয়ারে ইসলাম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ি টুপি, নামাজ-রোজা হজ্ব জাকাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোও হুমকিতে পড়ছে।

দীর্ঘদিন প্রকৃত ইসলামী রাজনীতির শূন্যতার কারণে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শকে মানুষের সামনে তুলে ধরার মতো লোকের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইসলামী অনুশাসন চর্চার অভাবে শিক্ষিত তরুণরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ও অন্যায়ের আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

দেশের ছাত্ররাজনীতি বৃহত্তর ভোগবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত। দলীয় স্বার্থে নেতার কথায় হত্যা, খুন-গুম ছাত্রনেতাদের নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়েছিলো।

ছাত্ররা বই-খাতা নয়; বরং অস্ত্র বহন করতো। চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী ও হলদখল ছাত্ররাজনীতির কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো।

অপরদিকে মাদরাসাসমূহে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ছিলো। সব মিলিয়ে অবস্থা ছিলো যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে সে মাস্তান আর মাদরাসায় পড়াশোনা করলে সে হয় সমাজবিচ্ছিন্ন।

এমনজটিল পরিস্থিতি অনুধাবন করেই ১৯৯১ সালে ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো।

ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর সাবেক একজন দায়িত্বশীল হিসেবে প্রিয় সংগঠনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আজ আমি নিজেও গর্ববোধ করছি।

প্রিয় ভায়েরা আমার!

আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্মরণ করানোর জন্যই এই দীর্ঘ ইতিহাস এবং ছাত্রআন্দোলন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা করলাম।

আপনারা যারা কোন না কোন দিন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সদস্য বা দায়িত্বশীল ছিলেন, যারা এই কাফেলায় শামিল হয়েছেন, তাদের দায়িত্বও বিশাল। এই জাতির হাজার বছরের মুক্তির স্বপ্ন আপনাদের কাঁধে।

আজকের এই পুনর্মিলনী সমাবেশে আমি আপনাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলোকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

-এদেশের লাখো তরুণ বৃটিশপ্রবর্তিত শিক্ষার কারণে ঈমান-আকিদা ধ্বংস করে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের ইমান-আকিদা রক্ষার জিম্মাদারী আপনাদের।

-কোটি কোটি মুসলিম তরুণ আজকে সুন্নাহের পথ ছেড়ে পশ্চিমা গোমরাহির পথে ধাবিত হচ্ছে। তাদেরকে রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের।

-মুসলমানের দেশে মুসলিম সন্তানেরা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এদেরকে ইসলামী জ্ঞানে শিক্ষিত করার জিম্মাদারী আপনাদের।

-মুসলিম সন্তানেরা জ্ঞানের অভাবে এবং পশ্চিমা অপপ্রচারের কারণে ইসলামের সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছে। এদের ভুল ভাঙ্গানোর জিম্মাদারী আপনাদের।

-এদেশের মুসলিম সন্তানেরা ইসলামকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে। এদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জিম্মাদারী আপনাদের।

-মাদরাসার শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে সীমিত গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। ইসলামের সামগ্রিক ধারণা থেকে তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখছে। এদেরকে জনসম্পৃক্ত করার জিম্মাদারি আপনাদের।

-মুসলিম বাংলাদেশে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চলছে। এর মোকাবিলায় মুসলিম জনতাকে সংগঠিত করার জিম্মাদারী আপনাদের।

-দেশে ইসলামবিরোধী নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আক্রমণ করা হচ্ছে। এর প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জিম্মাদারী আপনাদের।

-লেখালেখির মাধ্যমে, গান-কবিতার মাধ্যমে, প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামকে হেয় করা হচ্ছে। এর প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জিম্মাদারী আপনাদের।

-ইসলামকে কলংকিত করতে ইসলামের নামে সন্ত্রাস, মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। একে প্রতিহত করে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরার জিম্মাদারী আপনাদের।

-ইসলামের দর্শনগত মজবুতি, আধ্যাত্মিক শক্তিও চরিত্র মাধুর্যকে নষ্ট করার অপতৎপরতা চলছে। ইসলামের দর্শনের যথাযথ ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক চর্চার প্রচলন ও চরিত্র মাধুর্যের বিকাশ ঘটানোর জিম্মাদারী আপনাদের।

-স্বাধীনতার ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ এখনো পায় নাই। ইসলামকে কেন্দ্র করে মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেয়ার জিম্মাদারী আপনাদের।

-সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতি দূর করে আদর্শভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জিম্মাদারী আপনাদের।

-৯২ ভাগ মুসলমানের দেশে সংবিধানে আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা হয়েছে। তা স্থাপন করার জিম্মাদারী আপনাদের।

-ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিম্মাদারী আপনাদের।

-এদেশের আইন আল্লাহর কুরআনের আইনকে বাতিল ঘোষণা করেছে। কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জিম্মাদারী আপনাদের।

সমবেত ভায়েরা আমার!

সময়ের আবর্তনে আপনাদের বয়স বেড়েছে। আপনারা ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী আপনি ছাত্র আন্দোলন থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু, মনে রাখবেন– আপনার দায়িত্ব কর্তব্য থেকে আপনি অবসর নেননি, নিতে পারেন না।

কী করে আপনি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য থেকে অবসর নেবেন? এখনো তো আপনার লক্ষ্য অর্জন হয়নি। যে স্বপ্ন নিয়ে আপনি ছাত্র আন্দোলনে এসেছিলেন, তা পূরণ হয়নি। এখনো এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্তমান সিলেবাসে রাসুল (সা.) এর জীবনী, হযরত আবু বকর-ওমরের জীবনী বাদ দিয়ে রামের জীবনী প্রবেশ করানো হয়েছে।

স্বাধীনতার ৪৫ বছরে এসে আজও ভারতীয় পানি আগ্রাসনের শিকার হয়ে লাখো মানুষকে বন্যায় সর্বসান্ত হতে হয়। দেশের বনসম্পদ ধ্বংস করে ভিনদেশী প্রভুর চাহিদা পূরণ করতে হয়। দেশের বুক চিরে ট্রানজিটের মতো নতজানু চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। আজও এদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ভিনদেশি প্রভুরা। আজও দেশে বাকস্বাধীনতা নাই, কর্মের স্বাধীনতা নাই।

ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়ার জন্যে ১৯৭১ এ যে জাতি চূড়ান্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আজ স্বাধীন দেশেও মানুষের ভোটাধিকার নাই।

এমন পরিস্থিতিতে আপনি অবসর নিতে পারেন না। বসে থাকতে পারেন না।

অতএব আসুন, আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ইসলাম দেশ জাতি ও মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসি।

বর্তমান ছাত্র ভাইদেরকেও আমি এ আদর্শিক কাফেলাকে তার লক্ষ্য অর্জনে আরো দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।



গুলশান ও শোলাকিয়া হামলা

শেখ ফজলুল করীম মারুফ

বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্যোগময় সময় অতিক্রম করছে। আমাদের ইতিহাসে রাজনৈতিক রক্তপাত, ব্যক্তিগত খুনোখুনি, হত্যা এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নজীর থাকলেও সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, আদর্শিক কারণে হত্যা এবং বিশেষ পদ্ধতিতে কুপিয়ে জবাই করে হত্যার দৃষ্টান্ত বিরল। অতি সাম্প্রতিককালে গুলশানে যে ধরনের জিম্মি কাণ্ড ঘটলো তা কেবল আমরা খবরেই দেখেছি এবং এরপরে শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে হামলা প্রচেষ্টা জাতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। জাতি হিসেবে আমাদের শান্ত ও ধর্মপ্রাণ পরিচয়, দেশের আইন শৃংখলা বাহিনীর যোগ্যতা দক্ষতাকে এবং সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

বর্তমান হামলাসমূহের দৃষ্টান্ত আরো বিরল একারণে যে, এবারের হামলার সাথে জড়িত অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত সমাজের ছেলেরা জড়িত। তাদের দাবী নতুন কিছু না হলে; তারা যে ধরনের ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছে তা এ ভূখণ্ডের মানুষের জন্য নতুন। একারণেই বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছে।

গুলশান হামলার পরে এই হামলার নানাবিধ বিশ্লেষণ হচ্ছে। অনেকেই মতলবি ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রত্যেকে তার রাজনৈতিক ফায়দা লোটার পাঁয়তারা করছে। প্রতিপক্ষকে দমন করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে। অনেকেই এর সাথে বৈশ্বিক উগ্রপন্থার যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন, আমরা এর নিরেপেক্ষ একটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

এই হামলা কি বৈশ্বিক উগ্রবাদের বাংলাদেশ অংশ?

গুলশান হামলার পরে এই প্রশ্নটা বারবার সামনে আসছে। এটা কি বৈশ্বিক উগ্রপন্থার সাথে সম্পর্কিত? বিশেষত হামলাটার ধরন, হত্যার ধরন এবং তাদের দাবির প্রেক্ষিতে প্রশ্নটা বেশ জোরালোভাবে উঠছে। এবং বৈশ্বিক উগ্রপন্থার সাথে এটাকে সম্পর্কিত করে দিলে সহজেই দায় এড়ানোর একটা পথ খুঁজে পাওয়া যায় বলে অনেকের কাছেই এই পন্থা খুব জনপ্রিয়। আসলে কি? এই হামলাকে বৈশ্বিক উগ্রবাদের বাংলাদেশ অংশ বলে প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে আমাদেরকে বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বৈশ্বিক উগ্রপন্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশে এর বিস্তারের কোন ধারণা পাওয়া যাবে না। কারণ-

১. বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ অতীত:

যেসব দেশ বৈশ্বিক উগ্রবাদের শিকার হচ্ছে, তার প্রধানতম কারণ হলো, জাতিহিসেবে তাদের অতীত পাপের ইতিহাস। মানবতাকে রক্তাক্ত করার ইতিহাস। ফ্রান্স বর্তমানে বৈশ্বিক উগ্রবাদের অন্যতম ক্ষেত্র, কারণ ফ্রান্সের রয়েছে কট্টর ক্যাথলিক জাতি হিসেবে ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করার ইতিহাস এবং জেরুজালেম কেন্দ্রিক যুদ্ধে জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে নির্মম মানুষ হত্যার ইতিহাস। ফ্রান্সই একমাত্র ঔপনিবেশিক দেশ যারা উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার সকল মুসলিম দেশে দীর্ঘ সময়ে শোষণ করেছে। আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরোক্কো, মালি, সেনেগাল, বার্কিনা, ফুসো ও আইভরি কোস্টের ভাষা-সংস্কৃতি পর্যন্ত যারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারত, পাকিস্তান স্বাধীন হলেও ফ্রান্স এই সব দেশকে স্বাধীনতা দেয় নাই। রক্তাক্ত সংগ্রাম করে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। এখনো এসব দেশে ফ্রান্স সামরিক হস্তক্ষেপ করে চলছে। এর অর্থ হলো ফ্রান্সের ইতিহাস মুসলিমদের হত্যাকরার ইতিহাস, মুসলমানদের স্বাধীনতা ও মানবতা খর্ব করার ইতিহাস।

এভাবে বিশ্বের যেখানেই এ ধরনের হামলা দেখা গিয়েছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাদের সবারই ইতিহাস একজন খুনির ইতিহাস। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস এমন না। আমরা জাতি হিসেবে কখনোই ঔপনিবেশিক ছিলাম না। বরং উল্টো আমাদের ওপরেই ঔপনিবেশিক অত্যাচার হয়েছে। সেজন্যই বৈশ্বিক উগ্রবাদী হামলার সাথে বাংলাদেশে হামলার যোগসূত্র স্থাপন করার তত্ত্ব বাস্তব সম্মত না।

২. বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি:

বৈশ্বিক উগ্রবাদ জনিত সহিংসতার আরেকটি কারণ হলো, মুসলিম দেশগুলোর প্রতি পশ্চিমা দেশের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষেত ইরাক, সিরিয়া, আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, লিবিয়া, তিউনিসিয়া এবং ইয়ামেনসহ বহু মুসলিম রাষ্ট্রে পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রাসী সামরিক হামলার কারণে নৃশংস অবস্থা তৈরি হয়েছে। তার প্রতিক্রিয়ায় কোথাও কোথাও কিছু ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে এই কারণও সক্রিয় না। বাংলাদেশ কোনদিনও অন্যকোন রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করার নীতি গ্রহণ করে নাই। তাই বৈশ্বিক উগ্রবাদের শিকার হওয়ার কোন কারণ বাংলাদেশের নাই।

৩. পশ্চিমা স্বার্থের অনুপস্থিতি:

এর বাহিরেও কিছু আফ্রিকান দেশে এই ধরনের হামলা হয়েছে। কিন্তু তা ছিলো পরিষ্কারভাবে পশ্চিমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, বাংলাদেশে পশ্চিমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তেমন কোন স্থাপনা নাই। এই সব বিবেচনার বলা যায় যে, বৈশ্বিক উগ্রবাদের যে মোটিভ তা বাংলাদেশে ক্ষেত্রে নাই।

তাহলে কি কোন ষড়যন্ত্র?

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হচ্ছে দায় এড়ানোর সবচেয়ে সহজ পন্থা। কোন কিছু হলেই দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র বলে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে প্রশান্তির ঢেঁকুর তোলা আমাদের রাজনীতিবিদদের অতিচর্চিত নোংরা একটা কাজ। গুলশান হামলাসহ অন্য সন্ত্রাসী হামলাগুলোকে ষড়যন্ত্র বলে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব মেনে নিলেও প্রশ্ন আসবে কে ষড়যন্ত্র করলো? কে সে বা তারা যারা ষড়যন্ত্র করলো? ষড়যন্ত্রে তারা সফল হলো কি করে? এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে, কেন তারা সফল হলো আর আমরা ব্যর্থ হলাম তার কারণ খুঁজতে হবে? এবং দায় নিতে হবে। আমরা মনে করি, এখানে কোন ষড়যন্ত্র নাই। ষড়যন্ত্র থাকলেও তা আমাদের সৃষ্ট সুযোগের কারণেই হয়েছে। আজকের আলোচনায় আমরা এই সন্ত্রাসবাদের পিছনে আমাদের ও সরকারের কি দোষ আছে তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো এবং বীরের মতো নিজের দায় স্বীকার করে ভুলগুলো সংশোধন করার আহ্বান জানাবো।

উগ্রবাদের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশেই তৈরি হয়েছে:

সুদূর সিরিয়া থেকে কেউ এসে আমাদের মেধাবী তরুণদেরকে জাদুমন্ত্র বলে সন্ত্রাসী বানিয়ে ফেলেছে বলে বিশ্বাস করা বোকামী। সর্বোচ্চ হতে পারে যে, সিরিয়া অন্য মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানদের ওপরে চলা নির্যাতন সহিংস পন্থায় প্রতিশোধ নেয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু উগ্রপন্থার দিকে যাবার প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে এদেশেই। ইসলামের প্রকৃত দর্শন, শিক্ষা, সমরনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামকে বাদ দেয়া, তরুণদেরকে ইসলামী আদর্শিক সংগঠনে যোগদানে বাধা প্রদান করা, ইসলামের অনুশাসন মানতে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা, পরিকল্পিতভাবে একের পর এক ইসলামের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে আঘাত করা, কেউ সে সব আঘাতের প্রতিবাদ করলে তাকে জঙ্গী, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করা, তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে প্রশাসনের দমনপীড়ন চালানো, বৈশ্বিক মুসলিম অত্যাচারে মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে সরকারের সংকোচ, মুসলিম নির্যাতনকারী দেশসমূহের সাথে সরকারের হৃদ্যতা, সরকারের কথাবার্তা কাজে কর্মে ইসলামের সাথেই বিমাতাসুলভ আচরণ, সেই আচরণের প্রতিবাদে বাধা, বাকস্বাধীনতা হরণ করা, চূড়ান্ত দলীয়করণ, সুশাসনের অভাব, গণতন্ত্র বিসর্জন, ভিন্নমত দমনে কট্টরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, ভারতের সাথে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, পশ্চিমা সংস্কৃতির ফলে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, বাঙ্গালী ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি উন্নাসিকতা ইত্যাদি কারণে এদেশেই উগ্রবাদের জন্ম হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

উগ্রবাদের অন্যতম কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা:

ইসলাম আসলে কি? ইসলামকি কোন রাজনৈতিক মতবাদ নাকি আচার সর্বস্ব কোন বিশ্বাস? বস্তু সম্পর্কে ইসলামেরর বিশ্বাস কি? ইসলামে রাষ্ট্র বা রাজনীতি সম্পর্কে নির্দেশনা কি? ইসলামী হুকুমত বলতে কি বুঝায়? ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় অনুসরণীয় পথ কোনটা? ইসলামে জিহাদের অর্থ কি? জিহাদের ক্ষেত্র কি? জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ইসলামের আধ্যাত্মবাদ, রাজনৈতিক দর্শন, সমাজ দর্শন, জীবন দর্শন সম্পর্কে আমাদের তরুণ সমাজ একেবারেই অজ্ঞ। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কোন ব্যবস্থানাই। আগে সকালে মক্তব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো এখন তাও নাই। সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একজন যে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করবে তেমন পরিবেশ নানা অপপ্রচারে নষ্ট করা হয়েছে। শুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান চর্চার উদ্যোগসমূহকে বিরল করে ফেলা হয়েছে। ফলে একজন তরুণ ইসলামে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে, কিন্তু তার অবচেতন মন থেকে ইসলামের প্রতি একটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করে। তারুণ্যের এই আকর্ষণ সুপ্ত থাকলেও যখন তারা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে মুসলমানদেরকে হত্যা করার দৃশ্য দেখছে তখন তার সেই সুপ্ত বোধ জাগ্রত হচ্ছে। অথচ সে ইসলামের প্রতিরোধ নীতি, সমরনীতি, ইসলাম হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ পদ্ধতি জানে না। এরই সুযোগ নিচ্ছে অপরাধী চক্র। তারা ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝিয়ে তারুণ্যকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি ধাবিত করছে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা (যা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সৃষ্ট) এর কারণেই সন্ত্রাসবাদের প্রসার ঘটেছে এদেশে।

প্রশ্ন আসবে তাহলে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা কেন সন্ত্রাসবাদের প্রতি ধাবিত হচ্ছে?

আমাদের মাদরাসাসমূহ ইসলামী জ্ঞানের আঁকড়, ইসলামী জ্ঞানকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে আকাইদ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত জ্ঞান ও ইবাদতের সংক্রান্ত জ্ঞানের চর্চা এখানে বেশ ভালো মতোই হয়। কিন্তু দু:খজনক বাস্তবতা হলো, ইসলামের অন্তর্নিহীত দর্শন, ইসলামী হুকুমতের স্বরুপ, হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি, ইসলামের প্রতিরোধ নীতি, সমরনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা হয় না। সন্ত্রাসবাদের যে হামলা হয় তা আকিদা বিশ্বাস আর ইবাদতের জ্ঞান না থাকার জন্য না বরং সমাজ, রাষ্ট্র ও খেলাফত সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবে। এই অভাব মাদরাসাসমূহেও বিরজামান।

প্রশ্ন হলো, মাদরাাসাসমূহে কেন এই জ্ঞানের চর্চার অভাব? এর অনেক কারণ, তবে অন্যতম কারণ হলো, সরকার ও সরকারের দলীয় লোকজনের বাধা, এই সব জ্ঞান চর্চা করতে গেলেই এলাকার নেতারা তেড়ে আসেন, "হুজুরদের আবার রাজনীতি কিসের?" বলে।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটা উৎস হতে পারতো মসজিদসমূহ। নামাজের পরে আলোচনা সভা, জুমার নামাজের বয়ান তরুণকে সাহায্য করতে পারতো। কিন্তু এখানেও সমস্যা; এলাকার নেতারা "মসজিদে রাজনীতি নিষেধ" ধরনের কথাবলে ইসলামী জ্ঞানের এই উৎসকেও বন্ধ করেছে।

ইসলামী আদর্শিক রাজনীতি বিকাশে বাধা:

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তরুণদের উগ্রবাদের দিকে ধাবিত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, আদর্শিক ইসলামী রাজনীতির বিকাশে বাধা প্রদান। বিশ্বব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের পরে পুঁজিবাদও এখন ব্যর্থতার মুখে। দারিদ্র, বেকারত্ব পরিবেশ আর যুদ্ধ ও শান্তি ইত্যাদি প্রশ্নে পুঁজিবাদের কাছে কোন সুষ্ঠু সমাধান নাই। সমাজবাদ ও পুঁজিবাদের এই ব্যর্থতার ধ্বংস্তুপে দাঁড়িয়ে সমাধানের নতুন পথ হিসেবে রাজনৈতিক ইসলামের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মানুষ পরিবর্তনের আশায় রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামকে দেখতে চায়। তাদের এই চাওয়ার শান্তিপূর্ণ উপস্থাপন হতে পারে আদর্শিক ইসলামী রাজনীতি বিকাশের মাধ্যমে কিন্তু পশ্চিমা রাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় সরকারগুলো বারংবার আদর্শিক ইসলামী রাজনীতি বিকাশে বাধা দিয়েছে। ইসলামী রাজনীতিক দলের বিকাশে দৃশ্যমান বাধার পাশাপাশি পর্দার অন্তরালে নানা কলকাঠি নেড়ে এই রাজনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সরকারগুলো। এবং মিডিয়াগুলো পরিকল্পিত উপক্ষো বা মিথ্যাচারের মাধ্যমে তথা কথিত সুশীল সমাজ অবিরাম মিথ্যা প্রচারনী চালিয়ে ইসলামী রাজনীতিকে শক্তিশালী কোন অবস্থানে যেতে দেয়নি। এক্ষেত্রে আদর্শিক ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যর্থতাও অনেকাংশে দায়ী। আদর্শ প্রসারে বাধাতো আসবেই কিন্তু ইসলামী দলগুলো তা অতিক্রম করতে পারে নাই। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে আজও এমন কোন আদর্শিক ইসলামী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা পায় নাই যারা তারুণ্যকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ দেখাতে পারে। এরই ফলে ইসলাম প্রত্যাশী তারুণ্য বিকল্প পথ হিসেবে উগ্রপন্থাকে বেছে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে আজ মিশর ও আফগানের সমকালীন বাস্তবতা তাদেরকে উৎসাহিত করছে যে, শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলেও পশ্চিমারা শাস্তিযোগ্য করে তা নাস্যাৎ' করে দেয়।

ইসলামী অনুশাসন মানতে নিরুৎসাহিত করা:

বাংলাদেশে কোন তরুণের পক্ষে ইসলামী অনুশাসন পালন করা ১০০ বার জীবন কোরবানী করার চেয়েও কঠিন। প্রথমত. মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতিক আগ্রসান চালিয়ে তারুণ্যকে ইসলাম বিমুখ করা হচ্ছে। সেই আগ্রাসন কাটিয়ে যারা অনুশাসন পালন করতে আসছে তারা সামাজে নানানভাবে হেনস্তার শিকার হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা, রাস্তায় প্রশাসনের অযথা হয়রানী ও মিডিয়ায় তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন হচ্ছে। এরফলে দুই ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যারা এই সব বাধার কারণে ইসলামী অনুশাসন থেকে দূরে সরে গিয়ে উগ্রবাদী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তারা একসময় হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতাবাদের নামে দিনে দিনে সামাজ বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার থেকেই সন্ত্রাসবাদে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে যারা এতসব বাধা উপেক্ষা করে ইসলামী অনুশাসনে উৎসাহী হচ্ছে- তাদের কেউ কেউ মুসলিম দেশে এতোসব বাধায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। যার সদ্বহার করে কেউ কেউ তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে বারবার আঘাত করা এবং তার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বাধা:

ইসলামের প্রাণপুরুষ, সকল মুসলমানদের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় রাসুল সা. এর প্রতি জঘন্য ভাষায় গালাগাল করা, তার পবিত্রত্মা স্ত্রীগণ সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ লেখালেখি করা, কথায় কথায় ইসলামকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করা কারো কারো ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বিধান হজ্জ, নামাজ, কোরবানী, আজান ইত্যাদি নিয়ে কটাক্ষ করা কারো কারো সৌখিনতায় পরিণত হয়েছে। ফেসবুক, ব্লগ, পত্রিকা ইত্যাদিতে ইসলাম বিরোধীরা প্রাকাশ্যেই এসব করে যাচ্ছে। ৯০ ভাগ মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে ইসলাম বিরোধীরা মুক্তমনা, বিজ্ঞান মনস্ক বলে অভিহিত হচ্ছে। সুশীল সমাজের তকমা পাচ্ছে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সরকারের আস্কারা পাচ্ছে এবং প্রশাসনের নিরাপত্তা পাচ্ছে। আর এর বিরোধীতা করতে গেলেই তার ওপরে জেল জুলুম নেমে আসছে, প্রশাসনের হয়রানীর শিকার হচ্ছে, সন্ত্রাসী মৌলবাদী তকমা খেতে হচ্ছে। নোংরা ও বিশ্রী ভাষায় আক্রান্ত হচ্ছে। ইসলাম বিদ্বেষীদের নোংরামীর প্রতিবাদে ফেসবুকে লিখলে আইডি ব্লক করা হয়, আইসিটি মামলা দেয়া হয়, ব্লগে প্রতিবাদ করলে গালাগালি শোনার পাশাপাশি ব্লগ বন্ধ হয়ে যায়। কোন সাহসী মিডিয়া এর প্রতিবাদ করলে তার লাইসেন্স বাতিল হয়, রাস্তায় নামলে লাশের মিছিলে শাপলা ট্রাজেডি হয়। এমন এক অসহনীয় পরিবেশে কেউ কেউ উগ্রপন্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বিশ্ব নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে সরকারের সংকোচ ও নিপিড়নকারী দেশগুলোর সাথে হৃদ্যতা:

চলতি শতাব্দিতে মুসলমানরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইরাক, আফগান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, বসনিয়া ইত্যাদি মুসলমান নির্যাতনে আরাকান উদহারণে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমা দেশে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ হিসেবে বংলাদেশের কর্তব্য ছিলো মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো, অত্যাচারী দেশগুলোকে কড়াভাষায় প্রতিবাদ করা। কিন্তু আমরা দেখেছি এর বিপরীত চিত্র। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের যখন সন্ত্রাসী বৌদ্ধরা পুড়িয়ে– কুপিয়ে হত্যা করে দেশ ছাড়া করছে, তখন সরকার তাদেরকে এদেশে আশ্রয় দেয় নাই, বার্মাকে শক্ত কোন প্রতিবাদ জানায় নাই। কাশ্মীর ইস্যুতে বরাবরই নিশ্চুপ! উল্টো

ভারতের সাথে হৃদ্যতা আর ভক্তি নিবেদন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো চিরন্তন সন্ত্রাসী দেশের আশীর্বাদ কামনা করে সরকার। অথচ ইরাক আফগান, সিরিয়া নিয়ে কোন কথা বলে না। সরকারের এই ভূমিকায় সাধারণ মুসলমানরা ব্যথিত হয়, এই ব্যথিত কোন হৃদয় হয়তো উগ্রবাদে ঝুঁকে পড়ছে:

সরকারের কথা-বার্তা-আচারে ইসলামের প্রতি বিমাতাসূলভ আচারণঃ

বিশ্বরাজনীতিতে নিপীড়কদের সাথে থাকার পাশাপাশি সরকারের কথা-বার্তা- আচরণেও ইসলামের প্রতি বিমাতা সুলভ মনোভাব স্পষ্ট। ইসলাম নিয়ে কটুক্তিকারীদেরকে সরকার পরিষ্কার প্রশ্রয় দিয়েছে, প্রতিবাদকারীদের প্রতি কঠোর হয়েছে, শিক্ষা আইনে ইসলামকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নারী নীতিমালায় কোরআনের বিরোধিতা করা হয়েছে, সরকারের মন্ত্রীদের কথায়, বক্তৃতায় ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, ইসলামী বইগুলোকে জিহাদী বই বলে ঢালাও অভিযোগ করা হয়েছে, মসজিদ মাদরাসায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ইসলাম অনুসরণ ও প্রচারকে বাধা দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এসব কারণেও কেউ কেউ উগ্রবাদের পন্থা বেছে নিয়েছে।

নিপীড়নমূলক সরকার পরিচালনাঃ

উগ্রবাদ সৃষ্টির পিছনে অন্যতম আরেকটি কারণ হলো, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ প্রচণ্ড কলুষিত ও শক্তি নির্ভর। এমন রাজনৈতিক পরিবেশ উগ্রপন্থার জন্ম হতে পারে বলে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞ একমত। এখানে ভোটের অধিকার নাই প্রকাশ্যে ডাকাতি করে ভোট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে প্রকাশ্যে পিটিয়ে গুলি করে হত্যা করছে। কোন রাজনৈতিক দল প্রতিবাদি কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামতে চাইলে হীন থেকে হীনতর সব পদ্ধতি অবলম্বন করে তা বানচাল করা হচ্ছে কোন প্রতিবাদ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। রাস্তায় প্রতিবাদী কর্মসূচি দিলেই গুলি করে হটিয়ে দেয়া হচ্ছে। কোন বুদ্ধিজীবী কথা বললেই তাকে হেস্তন্যস্ত করা হচ্ছে। ভিন্নমত দমনে মিথ্যাচার, প্রপাগান্ডা, আক্রমণ গুম-হত্যা, অপহরণ সব কিছুই করা হচ্ছে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা, ইতোপূর্বে বাংলাদেশ এত ভয়াবহ অবস্থা। আর কোনদিন দেখে নাই। এমনতর পরিবেশ উগ্রবাদের জন্য স্বর্গভূমি। এতে অবাক কি?

সুশাসনের অভাবঃ

শাসনের এতো অবস্থা খারাপ যে, সুসাশনের কোন মাপকাঠিতেই শাসন ব্যবস্থাকে পরিমাপ করার জো নাই। দেশটা মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। যে যেভাবে পারছে লুটেপুটে খাচ্ছে। দুর্নীতি এখন প্রকাশ্য ব্যাপার। খুন করা সাহসিকতা। গুম করা প্রশাসনিক কৌশল। চাঁদাবাজি দলীয় কর্মসূচি। জনতার কাছে জবাবদিহিতার প্রধান অবলম্বন। নির্বাচন হয় না, হলে তা ডাকাতিতে পরিণত হয়। সংসদে গৃহপালিত বিরোধী দল। প্রশাসনের দলীয় করণ। সব মিলিয়ে দেশে সুশাসনের লেশ মাত্র নাই। এমনতর পরিবেশে উগ্রবাদ জন্ম নেয়া অস্বাভাবিক কিছু না।

পশ্চিমা ও ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাবঃ

পশ্চিমা ও ভারতীয় সংস্কৃতি তারুণ্যকে ভোগবাদে লিপ্ত করছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ শিক্ষা দিচ্ছে। সিনেমাতে হরদম সহিংসতা দেখাচ্ছে। ভিডিও গেমে খুন খারাপি করছে। পর্ণতে আক্রান্ত হচ্ছে। স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। সমাজ পরিবারের প্রতি দায়বোধ হারাচ্ছে। উগ্রবাদের উত্থানের পিছনে এর ভূমিকা রয়েছে।

লক্ষণীয়ঃ

উগ্রবাদ একটি সামাজিক সমস্যা, কোন সোস্যাল ফেনোমেনার একক কোন কারণ থাকে না। সুনির্দিষ্ট ভাবে একথা বলা যায় না যে, এর কারণে এটা হয়েছে। বরং একই ঘটনার হাজারও কারণ ও ফলাফল থাকতে পারে। বিষয়টা এর বিপরীত। এ কোন কিছুর কার্যকরণ ও কার্যফল সুনিদিষ্ট।

উগ্রবাদ একটি স্যোসাল ফেনোমেনা। একেও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের ছাত্র ও যুব সমাজের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই একদৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি। এগুলোই একমাত্র কারণ সেটা না বরং অন্য কারণগুলো মধ্যে এগুলো অন্যতম।

উগ্রবাদ নিরসনে আমাদের প্রস্তবনাঃ

শিক্ষার সবস্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থিদের জ্ঞানী করতে হবে।
ইসলামী জ্ঞান চর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
আদর্শিক ইসলামী রাজনীতি বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।
শিক্ষর্থীদের কে আদর্শ ইসলামী ছাত্র সংগঠনে যোগদানে উৎসাহিত করতে হবে।
ইসলামী অনুসাশনে পালনে সহায়তা করতে হবে।
ইসলাম নিয়ে কটুক্তি বন্ধ করতে হবে।
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামকে তার যথাযথ প্রাপ্ত মর্যাদা দিতে হবে।
রাজনৈতিক পরিবেশ উন্মুক্ত করে দিতে হবে। জনতার ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রতিবাদ করার সুযোগ দিতে হবে।
সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
খুন-গুম-হত্যা আর চাঁদাবাজির রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।
সর্বপরী ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন মনে করে খেলাফত আলা মিনহাজিল নবুওয়াতই পারে সকল উগ্রবাদ দমন করে প্রকৃত সুখ ও শান্তি নিশ্চিত করতে। ৭১-এর প্রত্যাশার সফল বাস্তবায়ন কেবল খেলাফত আলা মিনহাজিল নবুওয়াতের মাধ্যমেই।

রাসূলুল্লাহ সা. এর জিহাদ ও বিশ্বব্যাপী তার রাজনৈতিক প্রভাব

মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

ইসলামী আন্দোলের কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবক

১. ইসলামী আন্দোলনে আমীরের আনুগত্য

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছে তার পেছনে মুনাফিকদের চালবাজি ও কলাকৌশলের প্রভাব ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সঙ্গে মুসলমানদের যে দুর্বলতাটা স্বীকার করতে হয় তা হলো মুসলিম মুজাহিদরা যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছিল। এখান থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সার্বক্ষণিক আমীরের আনুগত্যের সবক নিতে হবে।

২. ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি

দুনিয়ার যে কোন আন্দোলন-সংগ্রামে তার প্রাণবস্তু বা চালিকা শক্তিরূপে একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তি থাকতে হয়। কিন্তু আদর্শবাদী কোন আন্দোলনের সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যে নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হয় তার দৃঢ়তা ও সত্যতার ওপরই এর সবকিছু নির্ভর করে। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য নবীদের ব্যক্তিত্ব অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর উন্নতি ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলো ইসলামের উপস্থাপিত নীতিমালা ও নবীজীর আদর্শের ওপর। এ কারণে উহুদ যুদ্ধে নবীজী সা. এর শাহাদাতের ভুল সংবাদ প্রচার হওয়ার পর যখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা হতাশা দেখা দিলো তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকের আয়াত নাযিল করে মুসলিম মুজাহিদদের জানিয়ে দিলেন "মুহাম্মদ সা. একজন আল্লাহর রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ পদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর ক্ষতি করবে না। আল্লাহ শীঘ্রই তার কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (সূরা আলে ইমরান-১১৪)

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মীদের সান্ত্বনাবাণী

হযরত সাহাবায়ে কেরাম যখন জানতে পারলেন নবীজী সা. এর শাহাদাতের খবর সত্য নয়, তখন তারা পুনরায় সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। একপর্যায়ে কাফেররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষে যখন দেখা গেলো, ৭০জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

তাদের শাহাদাতে সকল মুসলমান মর্মাহত হয়েছিলো। তাই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন "তোমরা হীনবল হয়োনা এবং দুঃখিতও হয়োনা। তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।"

"যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিলো।"(সূরা আলো ইমরান-১৩৯-১৪০)

৪. মৃত্যুভয়ই সকল দুর্বলতার উৎস

মানুষের সমস্ত দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মৃত্যু ভয়। তাই এ সময়ে মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, তোমাদের মৃত্যুভয়ে পলায়ন অর্থহীন। কারণ মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত কোন প্রাণীরই মৃত্যু হতে পারে না।

৫. জিহাদ হবে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিয়তে

যদি কেউ গণিমতের মাল অর্জনের জন্য জিহাদে শরীক হয়, সে গণিমতের মাল থেকে কিছুতো পাবেই কিন্তু কোন প্রতিদান পাবে না। এর বিপরীতে যদি বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তবে সে পরকালে পুরস্কৃত হবে এবং গণিমতের সম্পদ থেকেও অংশ পাবে।

উল্লেখিত সবকগুলোর শেষ দু'টিকে কালামে পাকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। "আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর সময় অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে কিছু দেই এবং কেউ পরলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই। আর যারা শোকরগুজার তাদেরকে আমি শীঘ্রই তাদের পুরস্কার দান করবো।"(সূরা আলে ইমরান-১৪৫)

৬. শত্রুর শ্লোগানের জবাব শ্লোগান

যুদ্ধ শেষ হবার পর কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান তার দেশীয় হুবল নামক মুর্তির নাম নিয়ে শ্লোগান দিলো "হুবলদের জয়, হুবলদের জয়" নবীজী সা. হযরত উমর রা. কে তার জবাবে আল্লাহর নামে শ্লোগান দিতে আদেশ করলেন। তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহই সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।

৭. জাতীয়তার জন্য যুদ্ধ করলে শহীদ হয় না

উহুদ যুদ্ধে 'কুযমান' নামক এক ব্যক্তি বড় দক্ষতার সাথে লড়াই করে, আশ্চর্যপূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। সে একাই ৮জনকে হত্যা করে মাটিতে পড়ে যায়। তাকে যখন ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়, তখন এক সাহাবী তাকে সুসংবাদ প্রদান করলেন। তখন কুযমান বললো যে, আমাকে কিসের সুসংবাদ শুনাচ্ছো? আমি তো স্বজাতির সম্মান বজায় রাখতে যুদ্ধ করেছি। যখমের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে লোকটি পরিশেষে আত্মহত্যা করে বসে। রাসূল সা. বললেন, লোকটি জান্নামি। কারণ সে সবর করেনি এবং তার উদ্দেশ্য দীন ছিলো না।

উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয় আরো কিছু কারণ ও হেকমত

১. ঝগড়া ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়া

২. সাহস হারা হওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করেছিলে। যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং হুকুম সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং তোমরা যা ভালবাসো তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে।"(সূরা আলে ইমরান-১৬২)

৩. ঈমানের ক্ষেত্রে কাঁচা-পাকা, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদীর পার্থক্য করার জন্য ভালবাসার দাবী করলে বিপদাপদ সহ্য করতে হয়। আল্লাহ তার প্রেমিকদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য পরাজয় দান করলেন।

৪. "প্রিয় বান্দাদেরকে শাহাদাতের অমীয় শুধা পান করিয়ে আপন করে নেয়ার জন্য মানুষের মধ্যে এইদিনগুলো পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই। যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ তরতে পারেন এবং আল্লাহ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।"(সূরা আলে ইমরান-১৪০)

৫. মুসলমানরা যেন এই শাহাদাত ও পরাজয়ের মাধ্যমে নবীজী সা. এর হুকুম অমান্য করার গুণাহ থেকে পরিস্কার হতে পারে।

৬. আল্লাহ তার শত্রুদের স্বমূলে নির্মূল করার জন্য

যখন আল্লাহ তাআলার বন্ধুসমাজ শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন বন্ধুদের রক্তনদী দেখে আল্লাহর রহমতের নদীতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। এর ফলে শত্রুদের সমূলে নির্মূল করে দিবেন।

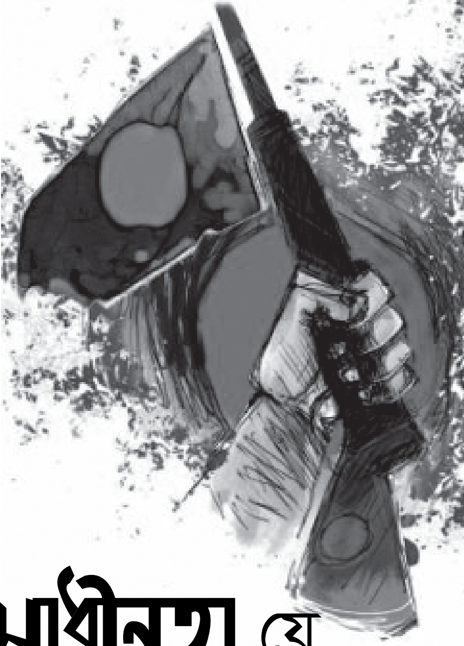
"আর উদ্দেশ্য (এও) ছিলো, যাতে আল্লাহ মুমিনদের পরিশোধন করতে পারেন। এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।"(সূরা আলে ইমরান-১৪১)

৭. যেন একথা সকলের জানা হয়ে যায় যে, আল্লাহ তার নিয়ম একই ধরণের রাখে না বরং কখনো বন্ধুকে সাহায্য করেন আর কখনো শত্রুকে। "আমি এ দিনগুলোকে মানুষের মাঝে আবর্তন করে থাকি" তবে শেষ পরিণতি মুমিন-মুসলমানদের পক্ষে। "আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম।"

৮. আত্মগর্ব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মুমিনদেরকেও মাঝে মাঝে পরাজয় দান করেন।

৯. ভগ্ন হৃদয়ে আল্লাহর নিকট বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করে করে নিজেদের মান-মর্যাদা যাতে বুলন্দ করতে পারে।

১০. মুমিনগণ যাতে এ কথা বুঝে নিতে পারেন যে, চরম পরিশ্রম ও পূর্ণ সাধনা ব্যতীত উচ্চ মর্যাদা ও সমুন্নত অবস্থান লাভ করা সম্ভব নয়। "তোমরা কি মনে কর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা দৃঢ়পদ।"(সূরা আলে ইমরান-১৪২)



স্বাধীনতা যে জনপদে পথ ভুলে যায়

আবু তাহের



শত শত বছর ধরে হাজারো প্রকৃতিপ্রেমী, পরিব্রাজক, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে ভূস্বর্গ হিসাবে খ্যাত কাশ্মীর। এটাকে শুধু উপামা বলা চলে না, বাস্তবিকই কাশ্মীরের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য আর সবকিছুকেই হার মানায়। কালের আবর্তে সব রঙ এসে মিশে গেছে যেন রক্তের লাল রঙে। বিধ্বস্ত বাড়ি ঘর, শত শত মা বোনের আহাজারী, লাশের স্তূপ, বারুদের গন্ধ যেন নরকে পরিণত করছে পৃথিবীর এই স্বর্গকে। আর এটা এখন নিত্যদিনকার খবর।

সম্প্রতি ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরের নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড সদরদপ্তরে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীদের হামলায় অন্তত ১৭ ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছেন। কাশ্মিরের উরি এলাকার এ ঘটনায় হামলাকারীদের চারজনও নিহত হয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে কাশ্মিরের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে চালানো হামলাগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এ ধরনের অপর একটি ঘটনায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সাত সদস্য নিহত হয়েছিল। ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে আসা ছয় অনুপ্রবেশকারী পাঞ্জাবের উচ্চ নিরাপত্তায় ঘেরা পাঠানকোট বিমান ঘাঁটিতে প্রবেশ করে নির্বিচার গুলি চালিয়েছিল।

এগুলো নতুন কোন খবর নয়। আর তাই পুরোনো ক্ষতকে নতুন করে জখম করা হল। দীর্ঘদিন ধরেই এই ক্ষত জিইয়ে রাখা হয়েছে। কিছুদিনে আগে ভারতশাসিত কাশ্মিরের শ্রীনগরে পুলিশের ছররা গুলিতে ঝাঁঝরা হয় এক স্কুল ছাত্রের বুক। কারফিউ ডাকে ভারত। বন্ধ করে দেয় ইন্টারনেট সেবা। কারফিউ ভঙ্গ করে নিহত ছাত্রের শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছে বিক্ষুব্ধ হাজারো মানুষ। গত দু মাসে চলা সহিংসতায় ৮০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে। আহত হয়েছে ১২ হাজারের বেশি মানুষ। ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কারফিউয়ের মধ্যে ঈদুল আযহা উদযাপন করে কাশ্মির। ঈদের দিনেও অনুষ্ঠিত হয়নি রাজধানী শ্রীনগরে ঐতিহ্যবাহী হযরতবাল মসজিদে ঈদের জামাত। গুরুত্বপূর্ণ ঈদগাহগুলোতে জামাত অনুষ্ঠান করতে দেয়া হয়নি। আর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জন্য ভারত ও পাকিস্তান দুদেশ দু'দেশকে দায়ী করে। আর বরাবরের মতই স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরের মানুষ তাদের নিজস্ব ভুখণ্ড বলে দাবী করে। মূলত কাশ্মির কার?

১৩৪৯ সালে শাহ মীর কাশ্মিরের প্রথম মুসলমান শাসক হিসাবে শাসন করেন। তার আমলেই সেখানে সালাতিন ই কাশ্মির বা স্বাতি রাজবংশের সূচনা হয়। তারা ছিল প্রায় পাঁচশ বছর। তারপরে ১৫২৬ থেকে ১৭৭১ সাল অবধি থাকে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে। এরপরে আফগান দুররানি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে ১৭৪৭ থেকে ১৮২০ সাল অবধি।

১৮২০ সালে রণজিত সিংহের নেতৃত্বে শিখরা কাশ্মির অধিকার করে। তার আমলে ডোগরা রাজপুত বংশের গোলাব সিং তাঁর কমান্ডার নিযুক্ত হন। বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে অমৃতসর চুক্তি'র

ভিতর দিয়ে ১৮৪৬ সালে জম্মু ও কাশ্মির ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গোলাব সিং কিনে নেন। ১৯২৫ সালে হরি সিং হন কাশ্মিরের রাজা। তার রাজত্বকালেই ১৯০৫ সালে জন্ম শেখ আবদুল্লার। তিনি ১৯৩০ সালের দিকে শ্রীনগর সরকারী হাইস্কুলে জুনিয়ার শিক্ষকের চাকরি পান। ১৯৪২ সালে একটি রিডিং রুম স্থাপন করেন শ্রীনগরে। সেখানে আলোচনা হত কাশ্মিরী মুসলমানদের দুঃখদুর্দশা কিভাবে দূর করা যায়, লেখাপড়া কিভাবে শেখানো যায়। একই সময়ে গোলাম আব্বাস জম্মুর মুসলমানদের নিয়ে একটা সংগঠন তৈরি করেন। অন্যদিকে পাঞ্জাবে ও লাহোরে কাশ্মিরী ও পাঞ্জাবী মুসলমানদের নিয়ে গঠিত 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির মুসলিম কনফারেন্স' কাশ্মিরের রাজনীতি নিয়ে চর্চা করতে থাকে। এদিকে দাবী উঠে 'মুসলমানরা স্বতন্ত্র'। বিক্ষোভ শুরু হয় কাশ্মিরে। দাবী ছিল মুসলমানদের চাকরি দিতে হবে, লেখাপড়া শিখতে দিতে হবে। ক্রমশ: ক্ষোভ বিক্ষোভ বাড়তে থাকে।

রাজা হরি সিং তাদের কাছ থেকে একটা ডেপুটেশন নিয়ে শোনে এরা কি বলতে চায়। তখন আবদুল কাদির নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিচারের সময় জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজার রক্ষীরা গুলি ছোঁড়ে। তাতে ২১ জন মারা যায়। শুরু হয়ে যায় কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলন। শেখ আবদুল্লাহ বললেন, 'এইভাবে আবেদন নিবেদন করে চলবে না, রাজনৈতিক দল করতে হবে।' তিনি প্রেমনাথ বাজাজ, গিরিধারীলাল ডোগরার মত হিন্দুদেরকেও নিয়েছিলেন সেই দল গঠনে। তৈরি হয় 'অল জম্মু এন্ড কাশ্মির মুসলিম কনফারেন্স'। কিন্তু শিখ ও হিন্দুরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হবার পরে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংগঠন করার জন্য দলের নাম বদল করে হল 'ন্যাশানাল কনফারেন্স'।

এদিকে তখন বৃটিশ রাজত্বে দুটো ভাগ ছিল। একটা বৃটিশ ইন্ডিয়া আর একটা করদ রাজ্য। করদ রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬৫টি। কিছু রাজ্য খুব বড় ছিল, যেমন মাইসোর, কাশ্মির, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি। বাকীগুলো অধিকাংশই ছিল ছোটছোট। রাজতন্ত্রে প্রজার কোন ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবী উঠতে থাকে সব জায়গায়। 'অল ইন্ডিয়া স্টেটস পিপলস কনফারেন্স' গঠন হয় সব রাজ্যের মানুষকে নিয়ে। তার প্রেসিডেন্ট হন জহরলাল নেহরু। তিনি ঘোষণা করেন, 'রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভিতরে গণতন্ত্র আনতে হবে। আর নেটিভ স্টেটকে ইন্ডিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। হয় ইন্ডিয়ায় যেতে হবে, নয় পাকিস্তানে যেতে হবে। স্বাধীন থাকতে পারবে না।' নেহেরু কাশ্মিরে গিয়ে শেখ আবদুল্লার সাথে সমঝোতা করেন। তারপর থেকেই ন্যাশানাল কনফারেন্স এর মধ্যে গোলমাল শুরু হয়, বিভাজন হয়। জম্মুর মুসলমান নেতা গোলাম আব্বাস আলাদা 'মুসলিম কনফারেন্স' গঠন করেন। তাকে জিন্না সমর্থন দেন। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে জিন্নার সম্পর্ক খারাপ হয়। ন্যাশানাল কনফারেন্স মহারাজ হরি সিংকে জানায়, 'তুমি তল্পিতল্পা গুটিয়ে কাশ্মির ছেড়ে যাও।'

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বৃটিশ সরকার জানায় কাশ্মির ও করদ রাজ্যগুলো স্বাধীন হয়ে যাবে। নেহরু তা মানেননি। দেশের প্রায় সব রাজারা ১৫ আগস্টের মধ্যে নেহেরুর ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতে যুক্ত হলেও কাশ্মির, জুনাগড় এবং হায়দ্রাবাদ তাতে সায় দিল না। ইতিহাসের এক নাজুক মুহূর্তে পাক-ভারতের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর কাশ্মিরের ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের উপজাতীয় পাঠান মুজাহিদরা কাশ্মির দখল করে নিচ্ছে, এই অজুহাতে আতংকিত মহারাজা হরি সিংকে ভারতের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য করা হলে ভারত জম্মু ও কাশ্মিরে তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রাজ্যটি দখল করে নেয়। মুজাহিদদের অগ্রাভিযান ভারতের আবেদনে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় মাঝপথে থেমে যায়। মোট উপত্যকার এক-তৃতীয়াংশ 'আজাদ কাশ্মির' হিসেবে ভারতের দখলমুক্ত হয়। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ জম্মু ও কাশ্মীর ভারত বিপুল সেনাবাহিনী দিয়ে আজ অবধি দখল করে রাখে। শুরু হয় নির্যাতন।

বর্তমানে দু দেশই কাশ্মিরকে তাদের দখলে রাখতে চায়। আর কাশ্মির? স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। তারা স্বাধীন ছিল, স্বাধীনই থাকতে চায়। আর এই দুদেশে রাজনীতির চালে বিশেষ করে বলি হচ্ছে মুসলমানরা। এর বেশ কিছু উদাহরণ উপরে দেয়া হয়েছে। কোন একটা অযুহাত দাঁড় করিয়ে ভারত সরকার বারবার মুসলমানদের উপর জুলম, নিপিড়ন চালাচ্ছে। বেনজির ভুট্টো সরকার, জেনেভার মানবাধিকার সম্মেলনে কাশ্মিরে ভারতের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলেও তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতের কূটচালে। ভারত আজ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মিরে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল, আন্তর্জাতিক কিংবা স্থানীয় মানবাধিকার গ্রুপকে প্রবেশ করতে দেয়নি। আর এক্ষেত্রে পাকিস্তানেরও যে যথেষ্ট স্বদিচ্ছা রয়েছে তাও নয়। যদিও হিসেব কষে দেখলে ভারত বারবার আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কাজ ঘটিয়েছে।

কাশ্মিরের আজাদী আন্দোলনের আপোষহীন নেতাদের মধ্যে বর্ষীয়ান ও প্রভাবশালী নেতা হচ্ছেন অল পার্টি হুররিয়াত কনফারেন্স নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানী। ভারত সরকার তাঁকে কয়েক মাস ধরে গৃহবন্দী করে রেখেছে। আয়েশা আন্দ্রাবী একমাত্র স্বাধীনতাকামী মহিলা নেত্রীকে বিগত ২৮ অগাস্ট, '১০ গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজাদী আন্দোলনের অপর শীর্ষ নেতা মাসরাত আলম বেশ কিছুদিন ধরে আত্মগোপনে থাকলেও বিগত ১৯ অক্টোবর/২০১০ তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীনতা দাবিতে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট, হরকত উল-জিহাদ-আল ইসলামি, লস্কর-এ-তৈয়্যবা, জৈস-এ-মুহাম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন এবং আল বদর বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

কাশ্মিরের শান্তি ফিরিয়ে আনতে সংলাপ, সমঝোতা ও ন্যায়নীতির বদলে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল বড় রকম রাজনৈতিক ভুল, যার মাসুল গুনেছে ভারত সরকার। দীর্ঘস্থায়ী সেনা মোতায়েন মানে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার যা জনমনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, দেখা দেয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ। গত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে নারী ধর্ষণ, নর-নারী হত্যা, বীভৎস নির্যাতনের যে গভীর ক্ষত কাশ্মিরী জনগণের মনে তৈরি করেছে তার অন্তর্জ্বালা কী সহজে জুড়াবে, ক্ষত শুকাবে?

আর এই চলমান অচলাবস্থা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে সংলাপে বসতেও নারাজ ভারত সরকার। তাদের বরাবরের অভিযোগ পাকিস্তান কাশ্মির দখল করে রেখেছে। বর্হিবিশ্বও এ ব্যাপারে নাক গলাতে আগ্রহী নয়। তাদের মত হল এই সমস্যার সমাধান দু'দেশের হাতে। তারাই এর সমাধান করবে। জুলুম নির্যাতনে পাকিস্তানের তেমন অংশ না থাকলেও মজার বিষয় হলো, কাশ্মির তারাও হাতছাড়া করতে নারাজ। বেশ কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাশ্মিরে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আত্মত্যাগ করেছে তাদের ভুললে চলবে না। আমাদের সমস্ত প্রার্থনা তাদের সঙ্গে আছে। আমরা ঐ দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন কাশ্মির পাকিস্তানের অংশ হবে।'

আর আমরা বিশ্ববাসী প্রহর গুনছি পারমানবিক যুদ্ধের। প্রতি মুহূর্তে ডামাডোল বাজছে যুদ্ধের। যে যার মত করে কসরত দেখাচ্ছে। রাজনৈতিক ইস্যুগুলো বরাবরের মত করে চাঙ্গা হচ্ছে। আর রক্তঝরছে কাশ্মিরে। আমরা আশা করি, দু'দেশই নমনীয় হয়ে (বিশেষ করে ভারত) সংলাপে বসবে। কাশ্মিরকে ছাড় দিতে হবে। ছাড় দিতে হবে পৃথিবীর ভূস্বর্গকে। সভ্য দুনিয়ায় বসে বর্বর, জঘন্য, কুৎসিত ভারতের এই রূপ আমরা দেখতে চাই না। দেখতে চাই না বিভৎস মা বোনের রক্তঝরা দেহ। আর যদি এ নাই হয় তবে হয়ত ভারতকে এর কঠিন মাসুল গুণতে হতে পারে। যেমনটি গুণছে অনেক দিন যাবত।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

abutaher16@gmail.com



■ প্রবন্ধ

রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্রঃ দেশের জন্য ক্ষতিকর উন্নয়ন প্রকল্প

আ হ ম আলাউদ্দীন

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেখানে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালনের একটি প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ২০১২ সালে সুন্দরবনের নিকটবর্তী রামপালে দু'টি ৬৬০ ইউনিট মিলে মোট১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশনের (এনটিপিসি) সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) চুক্তি স্বারিত হয়। চুক্তি স্বারের আগেই ২০১০ সালের ২৭ ডিসেম্বর কোনোরূপ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ না করেই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের আদেশ জারি করা হয় এবং অবকাঠামো উন্নয়নের রূপরেখা চূড়ান্তকরা হয়।

আর ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঋরহধষ জবঢ়ড়ৎঃ ড়হ ঊহারৎড়হসবহঃধষ ওসঢ়ধপঃ অংংবংংসবহঃ (ঊওঅ) ড়ভ ২ ৬৬০-৫০০) দ্ধ) গড ঈড়ধষ ইধংবফ চড়বিৎ চষধহঃ ঃড় নব পড়হংঃৎঁপঃবফ ধঃ ঃযব ষড়পধঃরড়হ ড়ভ কযঁষহধ নামে সেই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ পিডিবির ওয়েবাসাইটে ঝুলানো হয়েছে।১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এর মধ্যে মতামত চাওয়া হয়েছে। এভাবে পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়াই প্রকল্পের স্থান চূড়ান্তকরণ থেকে শুরু করে বিনিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলার পর পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য তৈরি ইআইএর উদ্দেশ্য ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে সচেতন মহলে। রামপালে বিদ্যুতকেন্দ্র দেশের জন্য কতটুকু উন্নয়ন বয়ে আনবে সেটি এনভায়র্নমেন্টাল ইমপেক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) বিশেষণের মাধ্যমে এখন আমরা দেখব।

সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্র মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটায় বলে সংরক্ষিত বনভূমি ও বসতির ১৫ থেকে ২০ কিমি এর মধ্যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় না। ইআইএ রিপোর্ট অনুসারে প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে যা সরকার নির্ধারিত সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিমি এনভায়রনমেন্টালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) থেকে ৪ কিমি বাইরে বলে নিরাপদ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। অথচ যে ভারতীয় এনটিপিসি বাংলাদেশে সুন্দরবনের পাশে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে সেই ভারতেরই ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশান অ্যাক্ট ১৯৭২ অনুযায়ী, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন বাঘ/হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল, জৈব বৈচিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য কিংবা অন্যকোন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা চলবে না। অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসিকে বাংলাদেশে সুন্দরবনের যত কাছে পরিবেশ ধ্বংসকারী কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে দেয়া হচ্ছে, তার নিজ দেশ ভারতে হলে সেটা

করতে পারতো না! আবার সুন্দরবন থেকে দূরত্ব আসলেই ১৪ কিমি কিনা সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে, অনেকেই বলছেন সুন্দরবন থেকে আসলে দূরত্ব ৯ কিমি। খোদ ইআইএ রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে প্রকল্পের স্থানটি একসময় একেবারে সুন্দরবনেরই অংশ ছিল, সেটেলার বা বসতি স্থাপনকারীরা বন কেটে আবাসভূমি তৈরি করেছে। (ইআইএ, পৃষ্ঠা২০৮ -)

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতিকর প্রভাব:

সাড়ে চার বছর সময় জুড়ে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে ৬৬০ মেগাওয়াটের দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট নির্মাণ হবে। এই সময়ে গোটা এলাকার পরিবেশ, কৃষি, মৎস ও পানি সম্পদের উপর নিম্নলিখিত প্রভাবসমূহ পড়বে:

১৩২০ (১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রামপালে ১৮৩৪ একর কৃষি, মৎস চাষ ও আবাসিক এলাকার জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যদিও ভারতে একই আকারের একটি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ৭৯২ একর যার বেশির ভাগটাই এক ফসলি কিংবা অনুর্বর পতিত জমি। (রায়গড় ইআইএ, এক্সিকিউটিভ সামারি, পৃষ্ঠা ১)। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ রিপোর্ট অনুসারে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার (১৮৩৪ একর) ৯৫ শতাংশই কৃষি জমি ও চারপাশের ১০ কিমি ব্যাসার্ধের এলাকার (স্টাডি এলাকা) ৭৫ শতাংশ কৃষি জমি যেখানে নিম্নো ক্ত হারে চিংড়ি অথবা ধান সহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা হয় পৃষ্ঠা,১৯৪,১৩৫ - ২০৪ ,১৯৮ ,১৯৭) :

ক) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০ ব্যাসার্ধের মধ্যে বছরে ৬২,৩৫৩ টন এবং প্রকল্প এলাকায় ১২৮৫ টন ধান উৎপাদিত হয়।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০ ব্যাসার্ধের মধ্যে বছরে ১,৪০,৪৬১ টন অন্যান্য শস্য উৎপাদিত হয়।

গ) প্রতি বাড়িতে গড়ে ৪/৩টি গরু, ৩/২টি মহিষ, ৪টি ছাগল, ১টি ভেড়া, ৫টি হাস, ৭/৬টি করে মুরগী পালন করা হয়।

ঘ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে বছরে ৫২১৮.৬৬ মেট্রিক টন এবং প্রকল্প এলাকায় (১৮৩৪ একর) ৫৬৯.৪১ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প এলাকায় (১৮৩৪ একর) ধান, মাছ, গৃহপালিত পশুপাখি ইত্যাদির উৎপাদন ধ্বংস হবে স্বীকার করে ইআইএ রিপোর্টে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে: সঠিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হলে এর বাইরের ১০ কিমি এলাকার মধ্যে কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না (!)। যদিও বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ কাজ, ড্রেজিং, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক ও তৈল নি:সরণ ইত্যাদির ফলে পশুর ও মাইদারা নদী, সংযোগ খাল, জোয়ার-ভাটার পাবণ ভূমি ইত্যাদি এলাকার মৎস আবাস, মৎস চলাচল ও বৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশংকাও প্রকাশ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা২৬৭ ,২৬৬ -)

২) নির্মাণের মালামাল ও যন্ত্রপাতি সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নদী পথে পরিবহন করা হবে। ফলে বাড়তি নৌযান চলাচল, তেল নি:সরণ, শব্দদূষণ, আলো, বর্জ্য নি:সরণ ইত্যাদি পরিবেশ আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে সুন্দরবনের ইকো সিস্টেম বিশেষ করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, ডলফিন, ম্যানগ্রোভ বন ইত্যাদির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে বলে আশংকা করা হয়েছে ইআইএ রিপোর্টে। (পৃষ্ঠা২৬৮ -)

৩) নির্মাণ কাজের যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যবহারের ফলে শব্দ দূষণ হবে। এক্ষেত্রেও নির্মাণ পর্যায়ে শব্দ দূষণের মাত্রা এবং সুন্দরবন ও প্রকল্পের চারপাশের পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়বে তা যাচাই করা হয়নি ইআইএ রিপোর্টে।

৪) প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যানবাহন, জেনারেটর, বার্জ ইত্যাদি থেকে তেল পুড়িয়ে ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নির্গত হবে। এই কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ কি হবে ও ক্ষতিকর প্রভাবই বা ৫/৪ বছরের নির্মাণ পর্যায়ে কিরূপ হবে তার কোন পর্যালোচনা এই রিপোর্টে করা হয়নি।

৫) নির্মাণ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের কঠিন বর্জ্য তৈরি হবে যা সঠিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে পরিবেশ এর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে বলে আশংকা করা হয়েছে।

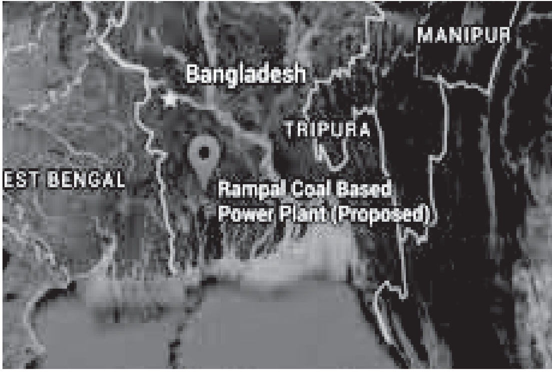
৬) ড্রেজিং এর ফলে নদীর পানি ঘোলা হবে। ড্রেজিং সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে তেল গ্রীজ ইত্যাদি নি:সৃত হয়ে নদীর পানির দূষিত হবে।

৭) পশুর নদীর তীরে যে ম্যানগ্রোভ বনের সারি আছে তা নির্মাণ পর্যায়ে জেটি নির্মাণসহ বিভিন্ন কারণে কাটা পড়বে। নদী তীরের ঝোপঝাড় কেটে ফেলার কারণে ঝোপ ঝাড়ের বিভিন্ন পাখি বিশেষ করে সারস ও বক জাতীয় পাখির বসতি নষ্ট হবে।

(সূত্র : রামপাল BAvBG, Impacts: pre-construction and construction stages, পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৩)

বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালন পর্যায়ে থাকার সময়কার প্রভাব:

পরিচালন পর্যায়কে ২৫ বছর ধরা হয়েছে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ রিপোর্টে। এই ২৫ বছর ধরে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সুন্দরবনের পরিবেশের উপর নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলবে:



১) ক্ষতিকর সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাস-

ইআইএ রিপোর্ট অনুসারে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৪২টন বিষাক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড (ঝঙ২) ও ৮৫টন বিষাক্ত নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড(ঘঙ২) নির্গত হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস সুন্দরবনের বাতাসে ঝঙ২ ও ঘঙ২ এর ঘনত্ব বর্তমান ঘনত্বের তুলনায় কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে গোটা সুন্দরবন ধ্বংস করবে। কিন্তু রিপোর্টে এর মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৭ নির্ধারিত সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য ইআইএ রিপোর্টে একটা জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে- পরিবেশগত 'স্পর্শকাতর' এলাকার মানদণ্ডের বদলে সুন্দরবনের জন্য 'আবাসিক ও গ্রাম' এলাকার মানদণ্ড বেছে নেয়া হয়েছে!

ইআইএ রিপোর্টে বলা হয়েছে, কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ঝঙ২ এর কারণে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে সুন্দরবনের বাতাসে ঝঙ২ এর ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৮ মাইক্রোগ্রাম থেকে বেড়ে ৫৩.৪ মাইক্রোগ্রাম হবে যা পরিবেশ আইন ১৯৯৭ (উঙ্গজ ১৯৯৭) অনুযায়ী আবাসিক ও গ্রাম্য (ৎবংরফবহঃরধষ ধহফ ৎঁৎধষ) এলাকার জন্য নির্ধারিত মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৮০ মাইক্রোগ্রাম এর থেকে অনেক কম।

একইভাবে সুন্দরবন এলাকার ঘঙ২ এর ঘনত্ব ১৬ মাইক্রোগ্রাম তিনগুণ বেড়ে থেকে ৫১.২ মাইক্রোগ্রাম হলেও তা নিরাপদ মাত্রার মধ্যেই থাকবে বলে দাবি করা হয়েছে। (ইআইএ, পৃষ্ঠা২৭৮ -)

কিন্তু প্রশ্ন হলো সুন্দরবন কি আবাসিক বা গ্রাম এলাকা? নাকি পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর একটি এলাকা? তাহলে সুন্দরবন এর মতো পরিবেশগত স্পর্শকাতর একটি এলাকার মানদণ্ড হিসেবে আবাসিক ও গ্রাম এলাকার জন্য নির্ধারত মানদণ্ড বেছে নেয়া হলো কেন? পরিবেশ সংরক্ষণ আইন১৯৯৭- ঘাটতেই কারণটা বোঝা গেল। এই আইন অনুসারে পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকার বাতাসে ঝঙ২ ও ঘঙ২ এর ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৩০ মাইক্রোগ্রাম (৩০ম/সও) এর চেয়ে বেশি থাকা যাবে না। যেহেতু পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ডের (৩০ম/সও) সাথে তুলনা করলে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প কোনভাবেই জায়েজ করা যাবে না। সেজন্য পরিকল্পিত ভাবেই পুরো রিপোর্ট জুড়ে সুন্দরবনের বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের ঘনত্বের মানদণ্ড হিসেবে আবাসিক ও গ্রাম এলাকার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ডকে ব্যাবহার করা হয়েছে!

২) পশুর নদী থেকে পানি প্রত্যাহার-

ইআইএ রিপোর্ট অনুসারে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাবহারের জন্য পশুর নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৯১৫০ ঘনমিটার করে পানি প্রত্যাহার করা হবে। কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শীতলিকরণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি পরিশোধন করে ঘণ্টায় ৫১৫০ ঘনমিটার হারে আবার নদীতে ফেরত দেয়া হবে। ফলে নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় কার্যকর পানি প্রত্যাহারের পরিমাণ হবে ৪০০০ ঘনমিটার। ইআইএ রিপোর্টে এভাবে পশুর নদী থেকে ঘণ্টায় ৪০০০ মিটার পানি প্রত্যাহারের ফলে পানির লবণাক্ততা, নদীর পলি প্রবাহ, পাবন, জোয়ার ভাটা, মাছসহ নদীর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ইত্যাদির উপর কেমন প্রভাব পড়বে তার কোন বিশেষণ করা হয়নি। এই যুক্তিতে যে ৪০০০ ঘনমিটার পানি পশুর নদীর শুকনো মৌসুমের মোট পানি প্রবাহের ১ শতাংশেরও কম। দুর্ভাবনার বিষয় হলো, প্রত্যাহার করা পানির পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম দেখানোর জন্য পানি প্রবাহের যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা সাম্প্রতিক সময়ের নয়, ৮বছর আগে, ২০০৫ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ণ বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত। (পৃষ্ঠা ২৮৫)

অথচ এই ইআইএ রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে, নদীর উজানে শিল্প, কৃষি, গৃহস্থালিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে নদী থেকে দিনে দিনে পানি প্রত্যাহারের পরিমাণ বাড়ছে যার ফলে শুকনো মৌসুমে দিন দিন পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে যা পশুর নদীর জন্যও একটি চিন্তার বিষয়। (পৃষ্ঠা ২৫০)

৩) পানি দূষণ-

কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পানি নির্গমণ হলে তাতে বিভিন্ন মাত্রায় দূষণকারী উপাদান থাকাটাই স্বাভাবিক, যে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বেলায় 'শূন্য নির্গমণ' বা 'জিরো ডিসচার্জ' নীতি অবলম্বন করা হয়। যে এনটিপিসি রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে যাচ্ছে, সেই এনটিপিসি যখন ভারতে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে তখন 'জিরো ডিসচার্জ' নীতি অনুসরণ করে।

যেমনঃ ভারতের ছত্তিশগড়ের রায়গড়ের কাছে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ "তবৎড় উরংপযধৎমব পড়হপবঢ়ঃং রিষষ নব ভড়ষষড়বিফ". (রায়গড় ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ, এক্সিকিউটিভ সামারি, পৃষ্ঠা ই১২ -)

কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পানি নির্গমণ করা হলে নির্গত পানির তাপমাত্রা, পানি নির্গমণের গতি, পানিতে দ্রবীভূত নানান উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় পানি দূষণ ঘটাবে যা গোটা সুন্দরবন এলাকার পরিবেশ ধ্বংস করবে।

৪) বিষাক্ত ছাই-

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে। এই ফ্লাই অ্যাশ, বটম অ্যাশ, তরল ঘনীভূত ছাই বা স্নারি ইত্যাদি ব্যাপক মাত্রায় পরিবেশ দূষণ করে কারণ। এতে বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্যারিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়াম মিশে থাকে। (পৃষ্ঠা২৮৮ -২৮৭-)

উৎপাদিত ছাই যেন পরিবেশ দূষণ না করে সেজন্য ফাই অ্যাশ চিমনি দিয়ে নির্গত হওয়ার আগেই ইএসপি সিস্টেমের মাধ্যমে ধরে রাখা হবে যদিও এরপরও 'কিছু উড়ন্ত ছাই' বাতাসে মিশবে বলে স্বীকার করা হয়েছে ইআইএ রিপোর্টেঃ (পৃষ্ঠা ২৮৫ ,২৭১)

আরো ভয়ংকর ব্যাপার হলো, একদিকে বলা হয়েছে এই বিষাক্ত ছাই পরিবেশে নির্গত হলে ব্যাপক দূষণ হবে (পৃষ্ঠা ২৮৭) অন্যদিকে এই ছাই দিয়েই প্রকল্পের মোট ১৮৩৪ একর জমির মধ্যে ১৪১৪ একর জমি ভরাট করার পরিকল্পনা করা হয়েছে! (পৃষ্ঠা২৬৩) এই বর্জ্য ছাই এর বিষাক্ত ভারী ধাতু নিশ্চিতভাবেই বৃষ্টির পানির সাথে মিশে, প্রকল্প এলাকার মাটি ও মাটির নিচের পানির স্তর দূষিত করবে যার প্রভাব শুধু প্রকল্প এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

উৎপাদিত বর্জ্য ছাই সিমেন্ট কারখানা, ইট তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পে ব্যাবহারের সম্ভাবনার কথা ইআইএ রিপোর্টে বলা হলেও আসলে কোন কারখানায় এর আদৌ কোন ব্যবহার হবে এরকম কোন নিশ্চিত পরিকল্পনা করা হয়নি। বড় পুকুরিয়ার মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই উৎপাদিত ছাই এরই উপযুক্ত ব্যবহার বাংলাদেশে হচ্ছে না। বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত দৈনিক ৩০০ মেট্রিকটন বর্জ্য ছাই কোন সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহারের বদলে ছাই এর পুকুর বা অ্যাশ পন্ডে গাদা করে রেখে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটানো হচ্ছে। ২০০৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চার বছরে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৬১৩ টন ছাই পুকুরে জমা করে পু কুরের প্রায় পুরোটাই ভরে ফেলা হয়েছে।

৫) শব্দ দূষণ-

কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন, জেনারেটর, কম্প্রেসার, পাম্প, কুলিং টাওয়ার, কয়লা উঠানো নামানো, পরিবহন ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যানবাহন থেকে ভয়াবহ শব্দ দূষণ হয়। সুন্দরবন এলাকায় রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বেধে দেয়া মাত্রার (দিনের বেলা ৫০ ডেসিবল, রাতে ৪০ ডেসিবল) চেয়ে বেশি শব্দ তৈরি হবে বলে ইআইএতে স্বীকার করা হলেও বলা হয়েছে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করার কারণে প্রকল্পের সীমার বাইরে উচ্চ শব্দ যাবে না।

সবুজ বেষ্টনি আসলে কতটুকু তৈরি করা হবে বা হলেও সেটা কতটা শব্দদূষণ প্রতিরোধ করতে পারবে এবং সেই সাথে সবুজ বেষ্টনির বাইরে কয়লা পরিবহন, ওঠানো নামানো, ড্রেজিং, স্থল ও নদীপথে বাড়তি যান চলাচল ইত্যাদির কারণে যে শব্দ দূষণ হবে তার ফলাফল সুন্দরবন ও আশপাশের পরিবেশের উপর কি হবে! ইআইএ রিপোর্টে বেষ্টনির বাইরের শব্দ দূষণকে অস্বীকার করা হয় নি, যদিও এর পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি।

৬) স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি-

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত সালফার, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদির বিভিন্ন যৌগ কিংবা পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, ব্যারিয়াম ইত্যাদি ভারী ধাতুর দূষণ ছাড়াও কুলিং টাওয়ারে ব্যাকটেরিয়া সংক্রামণের কারণেও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক আকারে নিউমোনিয়া জাতীয় রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে কয়লা পরিবহনের ফলাফল-

সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে প্রায় সারা বছর ধরে হাজার হাজার টন কয়লা পরিবহনকারী জাহাজ চলাচল করে গোটা সুন্দরবনের পরিবেশ ধ্বংস করে ফেলবে। বড় জাহাজে করে কয়লা সুন্দর বনের আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত আনতে হবে, তারপর আকরাম পয়েন্ট থেকে একাধিক ছোট লাইটারেজ জাহাজে করে কয়লা মংলাবন্দরে নিয়ে যেতে হবে। সরকারের পরিবেশ সমীক্ষাতেই স্বীকার করা হয়েছে, এভাবে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে কয়লা পরিবহনকারী জাহাজ চলাচল করার ফলে-

১) কয়লা পরিবহনকারী জাহাজ থেকে কয়লার গুড়া, তেল, ময়লা আবর্জনা, জাহাজের দূষিত পানিসহ বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নি:সৃত হয়ে নদী-খাল-মাটিসহ গোটা সুন্দরবন দূষিত করে ফেলবে।

২) কয়লা পরিবহণকারী জাহাজ ও কয়লা লোড-আনলোড

করার যন্ত্রপাতি থেকে দিনরাত ব্যাপক শব্দ দূষণ হবে।

৩) সুন্দরবনের ভেতরে আকরাম পয়েন্টে বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে কয়লা উঠানো নামানোর সময় কয়লার গুড়া, ভাঙা কয়লা পানিতে/মাটিতে পড়ে- বাতাসে মিশে মাটিতে মিশে ব্যাপক পানি-বায়ু দূষণ ঘটাবে।

৪) রাতে জাহাজ চলের সময় জাহাজের সার্চ লাইটের আলো নিশাচর প্রাণীসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চল সুন্দরবনের পশু-পাখির জীবনচক্রের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে ইত্যাদি

৫) চলাচলকারী জাহাজের ঢেউয়ে দুইপাশের তীরের ভূমি ক্ষয় হবে।

প্রস্তাবিত রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইআইএ রিপোর্টের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ইআইএ রিপোর্টে ভুল মানদণ্ড ব্যবহার, ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে দেখানো, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রার কোন পর্যালোচনাই না করা এমনকি খোদ ইআইএ রিপোর্টে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পরিচালানা ও কয়লা পরিবহণের ফলে সুন্দরবনের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে এমন সব তথ্য বেরিয়ে এসেছে যা প্রস্তাবিত কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পকে পরিবেশগত বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট।

বস্তুত, এর চেয়ে আরো সামান্য কারণে খোদ এনটিপিসিরই ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবেশগত অনুমোদন দেয় নি ভারতের কেন্দ্রীয় গ্রিন প্যানেল। গত ৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে ভারতের দ্যা হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত ঘঞচঈ'ং পড়ধষ-নধংবফ ঢ়ৎড়লবপঃ রহ গচ ঃঁৎহবফ ফড়হি বা 'মধ্যপ্রদেশে এনটিপিসির কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প বাতিল' শীর্ষক খবরে বলা হয়: জনবসতি সম্পন্ন এলাকায় কৃষিজমির উপর তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে ভারতের কেন্দ্রীয় গ্রীন প্যানেল মধ্যপ্রদেশে ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন (এনটিপিসি) এর ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়নি। অথচ বাংলাদেশে সেই এনটিপিসিকে ১৩২০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

অন্যান্য ক্ষতিকর বিপর্যয় :

মানবিক বিপর্যয়১৮৩০- একর ধানী জমি অধিগ্রহণের ফলে ৮০০০ পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্ম সংস্থান হতে পারে সর্বোচ্চ ৬০০ জনের, ফলে উদ্বাস্তু এবং কর্মহীন হয়ে যাবে প্রায় ৭৪০০ পরিবার। শুধু তাই নয় আমরা প্রতি বছর হারাবো কয়েক কোটি টাকার কৃষিজ উৎপাদন।

পরিবেশগত বিপর্যয়:

কয়লাভিত্তিক যেকোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অন্য যে কোনো প্রকল্পের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বিশেষত ভস্মিভূত কয়লার ছাই এবং উৎপন্ন গ্যাসের ফলে বায়ু ও পানি দূষণের যুগপৎ প্রভাবের কারণে এই ক্ষতি হয়। এ ধরনের প্রকল্প এলাকার আশেপাশের অঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে যা বৃক্ষ এবং বনাঞ্চলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে ভয়ানক মাত্রায়। যুক্ত রাষ্ট্রে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে দেশটির মোট কার্বনডাই অক্সাইডের ৮১ ভাগ উদগীরণ করেছে কয়লাভিত্তিক প্রকল্পগুলো, যা থেকে মোট শক্তির মাত্র ৪১ ভাগ পাওয়া গেছে। এই সকল বিবেচনায় পৃথিবীব্যাপি সকল দেশেই কয়লাভিত্তিক প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সাম্প্রতিককালে এই ধরনের প্রকল্প এড়িয়ে চলার চেষ্টাটাই বেশি চোখে পড়ে।

আর্থিক ও মর্যাদাগত বিপর্যয়:

এই প্রকল্পের অর্থায়ন করবে %১৫ পি ডি বি, %১৫ ভারতীয় পক্ষ আর %৭০ ঋণ নেয়া হবে। যে নীট লাভ হবে সেটা ভাগ করা হবে %৫০ হারে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনবে পি ডি বি। বিদ্যুতের দাম নির্ধারিত হবে একটা ফর্মুলা অনুসারে। কী সে ফর্মুলা? যদি কয়লার দাম প্রতি টন ১০৫ ডলার হয় তবে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ এর দাম হবে ৫ টাকা ৯০ পয়সা এবং প্রতি টন ১৪৫ ডলার হলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ৮ টাকা ৮৫ পয়সা। অথচ দেশীয় ওরিয়ন গ্রুপের সাথে মাওয়া, খুলনার লবণছড়া এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারাতে যে তিনটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের যে চুক্তি হয়েছে পি ডি বির সাথে সেখানে সরকার মাওয়া থেকে ৪ টাকায় প্রতি ইউনিট এবং আনোয়ারা ও লবন চড়া থেকে ৩ টাকা ৮০ পয়সা দরে বিদ্যুৎ কিনবে। সরকার এর মধ্যেই ১৪৫ ডলার করে রামপালের জন্য কয়লা আমদানির প্রস্তাব চূড়ান্ত করে ফেলেছে। তার মানে ৮ টাকা ৮৫ পয়সা দিয়ে পি ডি বি এখান থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কিনবো সেটা নিশ্চিত। কত লজ্জাজনক কথা, প্রকল্পে %১৫ বিনিয়োগে ভারতীয় মালিকানা %৫০। বিদ্যুতের দাম পড়ছে দ্বিগুণেরও বেশি। উচ্ছেদ হচ্ছে ৭৫০০ পরিবার। কৃষিজ সম্পদ হারাচ্ছে দেশ। পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে বাংলাদশে কিন্তু %৫০ শতাংশ মালিকানা ভারতীয় কোম্পানির?

লেখক: কেন্দ্রীয় তথ্য-গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন।



ইসলামী সমাজে নারীর স্থান অধিকার ও কর্তব্য

মোহাম্মাদ নোমান আহমাদ

নারী শব্দটি উচ্চারণ করলেই মানসপটে ভেসে আসে আমাদের সমাজের করুণ চিত্র যেখানে নারীরা ছিঁটকে পড়েছে তাদের শাশ্বত মর্যাদার সম্মানিত আসন থেকে। মাতৃত্ব ও গৃহিণীর ঘরোয়া কাজ ছেড়ে দিয়ে তারা বরণ করে নিয়েছে কাঠফাটা দুপুরে রাস্তায় মাটি কাটা কিংবা চৈত্রের খরতপ্ত অপরাহ্নে ইট ভাঙ্গার পেশায়। আবার কখনো সমান অধিকারের নামে পুরুষের ন্যায় নারীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে চলছে মাঠকর্মী রূপে। ক্ষমতার সুশোভিত লোভনীয় আহ্বানের শিকার হয়ে নারীও আজ ভাগ বসিয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বের আসনে। এতে করে তাদের হৃদয়-মন প্রশান্ত হচ্ছে না কি অশান্তির অনলে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছে তা এক প্রশ্ন বটে।

পুরুষের সৃষ্টিকর্তা যেমন আল্লাহ, তেমনি নারীর সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির কাকে কি দায়িত্ব দেবেন, সেটা তাঁর অধিকারভুক্ত বিষয়। এতে কারো কোন দখল নেই। সুতরাং নারী বা পুরুষের আল্লাহর সৃষ্টি হয়ে আল্লাহর দেওয়া বিধানের অনুসরণ করাই যথোপযুক্ত। সৃষ্টির বিপরীতে সৃষ্টির বিধান অকার্যকর, যুক্তিহীন ও স্রষ্টার নাফরমানিরই নামান্তর।

ইসলাম নারীকে কি অধিকার দিয়েছে কোথায় তাদের অবস্থান, তা জানতে হবে বুঝতে হবে। কিন্তু আমাদের মুসলিম নারী সমাজ আজ বিভ্রান্ত ঐ সকল নারীদের প্ররোচনায় যারা মুখে অনেক কিছু বলে যা ইসলামের নিয়ম বহির্ভূত। অথচ নবী করীম সা. বঞ্চিত নারী সমাজের উন্নয়ন, নারীর মর্যাদা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ দিকনির্দেশনা করে। এতে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। আমাদের নারীদের তা জানার সময় কোথায়?

ইসলাম নারীকে অবজ্ঞা না করে ঘোষণা দিয়েছে যে মানুষের জীবনধারাকে সুন্দর ও সাবলীল করতে নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে এবং উভয়েই উভয়ের মুখাপেক্ষী।

রাসূল সা. বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম এবং যে নিজ পরিবারের সাথে স্নেহশীল আচরণ করে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে সতী-সাধ্বী নারীরা একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত হয়ে থাকে। (সূরা নিসা- ৩৪)

পর্দাহীনভাবে চলাফেরার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের সমাজের নারীরা। আফসোস আমাদের কর্মদোষের। তা না হলে আমরা ইসলামের নিয়মনীতি না মেনে কেন ছুটছি মরীচিকার পেছনে যেখানে রয়েছে শুধু হতাশা আর অস্থিরতা? পদে পদে হতে হয় লাঞ্ছিত-বঞ্চিত আর অপমানিত? অথচ আমরা দেখতে পাই ইসলামী

শরীয়াতের হুকুম পর্দা মেনে চললে কোন নারীই আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ধর্ষিতা হত না । বরং তারা সম্মান পেত সর্বমহল থেকে।

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইসলামে মা হিসেবে নারীকে সুমহান সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন সমাজের বা ধর্মের সাথে তুলনা চলে না। বিশ্বনবী সা. উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে অবস্থিত। অর্থাৎ মাকে সম্মান করলে জান্নাত পাবে। পিতার চেয়ে মায়ের সম্মান অনেক উচ্চে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, পিতা-মাতার মধ্যে সন্তানের উপর মায়ের অগ্রাধিকার। মাকে যথাযথ সম্মান করলে জান্নাত অবধারিত। আবার মাকে দুঃখ কষ্ট দিলে সন্তানের পক্ষে জান্নাত লাভ করা অসম্ভব। তাই মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আর তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত-দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর। (সূরা নিসা- ৩৬)

মায়ের সম্মান ও মর্যাদা কত বড় তা মহানবী সা. এর বাণী থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও রাসূলের পরে সবচেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদা এবং সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য মা। সুতরাং সদাচারণ দ্বারা মাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম স্ত্রীকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়েছে, দাসী হিসেবে নয়। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে স্ত্রীদেরকে ভোগের পাত্রী, দাসী ও বাদীর মত ব্যবহার করত। কিন্তু ইসলাম নারীদের প্রতি এ অবমাননা ও অপমানকে দূর করে অনেক মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমনি স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। (সূরা বাকারা- ২২৮)

শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি মোটেও বৈষম্য করেনি। পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত ইকরা (পড়)। এ দিয়ে প্রত্যেক নর-নারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মর্মে হাদিস শরীফে হযরত নবী করীম সা. বলেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয।

ইসলাম শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের মর্যাদা দিতে গিয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, নারীর পক্ষে জ্ঞান ছাড়া পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলাম শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে উৎসাহ দিয়েছে। এই উৎসাহ পেয়ে হযরত আয়েশা রা. ছয় লক্ষ হাদিস ও সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলেন। ১৫৪৩ জন মহিলা সাহাবী ছিলেন যারা বিভিন্ন পর্যায়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষা-দীক্ষায়, সভ্যতা, চিকিৎসা বিদ্যায়, বক্তৃতায় কোন অংশেই নারী পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে মুসলিম নারীরা সাহিত্য, কাব্য ও বক্তৃতায় ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। নারীশিক্ষা যদি নিষিদ্ধই হত তবে রাসূল সা. হযরত আয়েশা রা.কে ছয় লক্ষ হাদিস ও সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে নিষেধ করতেন।

এছাড়াও নারীকে ইসলাম প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার স্ব স্ব অবস্থানে স্ব স্ব অধিকার দিয়ে এসেছে যা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হলেই নারীরা পাবেন তাদের সম্মান, মর্যাদা ও পরিপূর্ণ অধিকার। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে-বাক্যটি প্রবাদ হলেও চিরবাস্তব। একজন নারী যদি ঘরের দায়িত্ব পালন না করে বাহিরের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকেন তাহলে তার ঘর সামলাবে কে? যে নারী তার ঘরের উন্নয়ন করতে পারে না, তার দ্বারা দেশের ও জাতির উন্নয়ন করা কি সম্ভব হবে? হাদিস শরীফে মহানবী সা. বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। অথচ বর্তমানের নারী সমাজ সে দায়িত্বকে ভুলে গেছে, পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করছে। অথচ স্বাধীনতা চাই– এই শ্লোগান প্রত্যেকটি ঘরে মহামারীর মত দেখা দিয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, আহতদেরকে সেবা করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইসলামের নিয়ম নীতি মেনে চলে, রাসূল সা. এর আদর্শে পথ চলে আমাদের নারী সমাজের এমন ভূমিকা রাখা দরকার যা দ্বারা আগামী প্রজন্ম শিক্ষা নিতে পারে এবং তাদের জীবন সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে।

অতএব হে মুসলিম নারী সমাজ! নারী মুক্তির আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন নয়। ইসলামের অনুশাসন মেনে, শরীয়তের হুকুম- আহকাম সঠিকভাবে পালন করুন। কারণ, যে জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি লালন করতে জানে না তারা অনুন্নত ও নিকৃষ্ট। মুসলিম হিসেবে আমাদের অনুসরণীয় হচ্ছে আল কুরআন তথা রাসূলের জীবন আর্দশ। এই আদর্শকে লালনের মাধ্যমেই নারী জাতির সুমহান মর্যাদা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নারী জাতিকে শুভবুদ্ধি দান করুন এবং ভুল পথ ত্যাগ করে তাদের সবাইকে ইসলামী জীবন তথা প্রকৃত মর্যাদার পথে আসতে তৌফিক দান করুন। আমিন।

(লেখক :কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ইশা ছাত্র আন্দোলন)



বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ইসলামের প্রভাব ও সম্ভাবনা

নিজামুদ্দীন আল গাজী



ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ

ইসলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন দর্শন। আর এই জীবন দর্শনের মূলনীতির ওপর ইসলামী তামাদ্দুন বা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয় বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়; বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এর মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই কল্যাণ রয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি এমনই এক সংস্কৃতি যার মধ্যে রয়েছে দুনিয়াব্যাপী সম্প্রসারণের ক্ষমতা। এর কিছু মৌলিক দিক রয়েছে আর কিছু শাখাগত দিক। তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও আখিরাত এগুলো ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক দিক। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে নিজেকে ইসলামী সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে শামিল করে নিল। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত হলো তার বুনিয়াদি ইবাদত। আর শাখাগত দিক, নৈতিক কর্মকাণ্ড; যেমন- ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা, উপদেশ, পরোপকার, আদল, ইহসান, দয়া, ভালোবাসা, ক্ষমা-উদারতা, দানশীলতা ও বদান্যতা ইত্যাদির গুণাবলী সৃষ্টি। পাপাচার, রাগ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি অপরাধসমূহ বর্জন। অর্থনৈতিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় শ্রমের মজুরি আদান প্রদানও ইসলামী সংস্কৃতির আওতাধীন। সামাজিক ও ব্যবহারিক আচরণ, যেমন পিতা মাতার প্রতি সম্মান, সৌজন্যমূলক ব্যবহার, সুন্দর জীবন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিবেশীর অধিকার আদায় ইত্যাদি কার্যকলাপও ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্গত। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, রীতি-নীতি, জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি কোন কিছু

চর্চাকেই নিরুৎসাহিত করে না। তবে ইসলামের লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো উল্লিখিত বিষয়গুলো ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পন্ন হচ্ছে কি না? এর মৌল উপাদান ও ভিত্তিগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কি না? সাংঘর্ষিক না হলে তা গ্রহণ করা যাবে। আর সাংঘর্ষিক হলে তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

বাংলার সংস্কৃতি

সংস্কৃতি মানুষের জীবনের একটি বিকশিত ও পরিশীলিত রূপ। জীবন ধারার কাঠামো, বিস্তৃতি ও রূপ বৈচিত্রের বাইরে সংস্কৃতি কোনো ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বছর থেকে এ ধারাই অব্যাহত আছে। সংস্কৃতি যদি অপরিবর্তনীয় হতো তা হলে গোটা দুনিয়া জুড়ে মানবজাতির সংস্কৃতি হতো এক ও অভিন্ন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ দেখা গেছে। এগুলো সবই মানুষের বিভিন্ন জীবনধারা ও জীবন চর্চার ফল। জীবন চিন্তা ও জীবন দর্শনের ভিত্তিতে সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে এবং তা বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে কালের পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা তাঁদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

ইসলামী-জীবন চর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী সংস্কৃতিও তাদের হাত ধরে ঠিক তেমনি রূপ লাভ করে। বাংলার সংস্কৃতি ইসলামী রূপে রূপায়িত হয়েছে। ইসলামের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাহলে বলতে হয় বাংলার সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকে ইসলামী সংস্কৃতিতে সংস্কৃত হয়েছে। এ ভূখণ্ডে মুসলমানরাই আদি বাস গড়েছে। কারণ মুসলিম সমাজ ছাড়া ইসলামী-সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে না। তাই এই জনপদের মানুষ ইসলামপূর্ব প্রাচীনযুগে একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো এবং ইসলাম আগমনের পর তারা ইসলামকেই নিজেদের অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে বিষয়টিই এই নিবন্ধে প্রমাণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা প্রয়োজন। সংগত কারণেই নিবন্ধে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রাচীন বাংলা ভূমি

বর্তমানে বাংলাদেশ হিসেবে যে ভূ-খণ্ড আমাদের মাঝে পরিচিত প্রাচীন যুগে তার শুধু একটি মাত্র নাম ছিলো না, বরং এ সব এলাকার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যায়িত হতো।

১. উত্তরাঞ্চল- বরেন্দ্র (পুন্ড্রবর্ধন ও গৌড় এলাকাকে বলা হতো)।

২. দক্ষিণের নিম্নভূমি অঞ্চল- বঙ্গ। এ নাম থেকেই পরবর্তীকালে সমগ্র ভূ-খণ্ডের নামকরণ করা হয়।

৩. মেঘনার পূর্ববর্তী এলাকা- কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম সমতট নামে পরিচিত ছিলো।

এগুলোকে একত্রে 'বাংলা' নামকরণ মাত্র কয়েকশ বছর আগের ঘটনা। মুসলমান শাসনামলেই সর্বপ্রথম এ সমগ্র এলাকাকে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক অবধি লিখিত গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী গঙ্গার সর্বপশ্চিম ও সর্বপূর্ব দু'ধারার মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলই আসল বঙ্গ। এর প্রায় সবটুকুই (২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অংশবিশেষ ছাড়া) বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ 'সুবা-ই-বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত হয়।

ফার্সী বাঙ্গালাহ্ থেকে পর্তুগীজ Bengala বা pengala এবং ইংরেজি Bengal শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কেউ বলেছেন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয়ের লক্ষ্যে আক্রমণের প্রাক্কালে সতীর্থদের বলেন, 'বাংগ আল্লাহ' তথা 'আল্লাহর নামে তাকবির দাও' সেখান থেকে বাঙ্গলা হয়েছে।

বাংলার অধিবাসী

বাংলার আদি অধিবাসী কারা এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। প্রাচীনকালে এদেশের সবটুকু সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত না হলেও এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাই পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বেও এখানে মনুষ্য বসতি ছিলো বলে অনুমান করা হয়। অতি প্রাচীন কালে এখানে আর্যদের আগমনের পূর্বে অন্ততপক্ষে আরো চারটি জাতির নামোল্লেখ করা হয়। এ চারটি জাতি হচ্ছে: ১. নেগ্রিটো, ২. অস্ট্রো-এশিয়াটিক, ৩. দ্রাবিড় ৪. ভোটচীনীয়।

নগ্রিটো; নিগ্রোদের ন্যায় দেহ গঠন যুক্ত এক আদিম জাতির এদেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের বিবর্তনে বর্তমানে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক জাতি বাংলায় প্রবেশ করে নেগ্রিটোদের উৎখাত করে বলে ধারণা করা হয়। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

ফিকাহ সংকলনের ইতিহাস

মুহাম্মাদ মুস্তাকিম বিল্লাহ

কুরআনুল কারীমের ফায়সালা অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে দ্বীনের বোধ থাকা অত্যন্ত জরুরি এবং সমীচীন হচ্ছে একদল লোক ফিকহের গবেষণায় নিমগ্ন থাকবে এবং অন্যান্যরা তাদের কাছ থেকে সে বিষয়গুলো গ্রহণ করবে। মূলতঃ ফেকাহ কিতাবুলাহ এবং সুন্নাহ থেকে আলাদা কিছু নয়, বরং এ দুয়ের গভীরে থাকা বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে সামনে আসার নামই হচ্ছে ফিকাহ। সুতরাং ফিকাহ হচ্ছে ঐশী হেদায়েত এবং শরিয়াতে নববী হতে আবিষ্কৃত একটি বিষয়। এ কারণে কালামে হাকীমে এবং হাদীসে ফিকহের আভাস দেয়া হয়েছে। কালামে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে- "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যেন তারা দ্বীনের জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করে, এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে"। (সূরা : বাকারাহ-১২২)

হযরত রাসূলে কারীম সা. এর যুগ থেকেই ফিকাহ শাস্ত্রের সূচনা হয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে যে সকল বিষয় কুরআন-সুন্নাহতে নেই, সে বিষয়ে রাসুলে কারীম সা. হযরত সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদের পথ বাতলে দিয়েছেন। রাসুলে কারীম সা. এর ইন্তিকালের পর হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. নতুন নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে সেপথই অবলম্বন করেছেন এবং এ থেকেই জাতি তাদের আইনি প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলো মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

ফিকাহ এর সংজ্ঞা:

ফিকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। (লিসানুল আরব) ফিকাহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো, "শরিয়াহ'র বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে ব্যবহারিক শরিয়াহ'র বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়। (আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিলাতুহু)।

ফিকাহ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য: ফেকাহ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করা। এ অর্থেই ইমাম আবু হানিফা রহঃ বলেছেন, ফিকাহ হচ্ছে নফস এর পরিচয় লাভ করা তথা কি কি তার অনুকূলে (কল্যাণকর) এবং কি কি তার প্রতিকুলে (ক্ষতিকর) সে সম্বন্ধে জ্ঞান।

ফিকাহ এর আলোচ্য বিষয়: ফিকাহ এর আলোচ্য বিষয়গুলোকে নিম্নোক্ত বিভাগগুলোর অধীনে বিবেচনা করা যায়-

(১) ইবাদত: যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের নিয়ম কানুন বলে দেয়। যেমন- সালাত, সাওম, হজ্ব, ইত্যাদি।

(২) মু'আমালাত: সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান। যেমন- বেচাকেনা, ঋণ, ভাড়া, আমানত জামানত ইত্যাদি।

(৩) মু'আশারাত: মানবজাতির বংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান। যেমন- বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

(৪) উকুবাত: বিভিন্ন অপরাধ। যেমন- চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তি।

(৫) মুখাসামাত: আদালতি বিষয়। যেমন- অভিযোগ, বিচারবিধি, স্বাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি।

(৬) হুকুমাত ও খিলাফাত : শাসক নির্বাচন, বিদ্রোহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জিহাদ, সন্ধি, চুক্তি, কর আরোপ ইত্যাদি।

ফিকাহ এর উৎপত্তি:

ফিকাহ এর মূল উৎস হচ্ছে মানুষের প্রতি শরিয়ত প্রণেতা আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ সম্বলিত বাণী। অতএব বলা যায় যে, নবুয়াত প্রাপ্তির পর রাসুলুল্লাহ সা. এর মক্কী জীবন থেকেই ফিকাহ এর যাত্রা শুরু। কিন্তু মক্কী জীবনে পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নাযিল হলেও তার খুব সামান্য অংশই ছিল বিধিবিধান সম্বলিত।

আহকাম সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত আয়াতই মদীনায় হিজরত করার পর থেকে নাযিল হতে থাকে এবং মাদানী জীবনের দশবছর ব্যাপী তা চলতে থাকে। অতএব, আমাদের জন্য এটা বলাই অধিকতর যথার্থ হবে যে, ফিকহের সূচনা বা উৎপত্তি হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাদানী জীবনের শুরু থেকে অর্থাৎ প্রথম হিজরী থেকে। (আস-শাকসিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ)।

ফিকাহ এর বিকাশ:

এটি একটি বিস্তৃত বিষয় যার বিস্তারিত বিবরণ এই সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ থেকে অধ্যয়ন করা যেতে পারে, তবে এখানে সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

উৎপত্তিকাল থেকে শুরু করে ফিকাহ এর ক্রমবিকাশকে তিনটি পর্যায় বা যুগে ভাগ করা যায়।

(১) রাসুলুল্লাহ সা.-এর যুগে ফিকাহ।

(২) সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর যুগে ফিকাহ।

(৩) তাবাঈ-তাবে তাবীগণের যুগে ফিকাহ।

(১) রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে ফিকাহ:

এ যুগের সময়কাল হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সা.-এর মদীনায় হিজরত তথা ১ম হিজরী হতে তাঁর ওফাতের সময় অর্থাৎ ১০ম হিজরী পর্যন্ত। এ যুগে ফিকাহের যাবতীয় বিষয় সরাসরি রাসুলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ ওহী আল কুরআন ও পরোক্ষ ওহী যা হাদিসরূপে আমাদের কাছে এসেছে। যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফতওয়া ফারাইজ, দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশেষণ, কুরআনের হুকুম আহকামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি, সবই ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের রা. তা শিক্ষা দিতেন এবং বাস্তব সমাজে তা প্রয়োগ করে দেখাতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিকাহ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তথাপি পরবর্তী যুগের ফিকাহ শাস্ত্রের সব মৌলিক বিষয়ের গোড়াপত্তন এ যুগেই হয়েছিল। এমনকি, ফিকহের গতিশীলতার প্রধান উপকরণ যে ইজতিহাদ ও কিয়াস তার শিক্ষাও হয়েছে এ যুগেই। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদিস বিদ্যমান।

রাসুলুল্লাহ সা. মুআয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুআয তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব দিয়ে। রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে তা না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ দিয়ে।

রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, যদি রাসুলুলাহ সা. এর সুন্নাতে না থাকে? তিনি বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করে রায় দিবো। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার রাসুলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যাতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট। (মুসনাদে আহমদ)। এই হাদিসটি ইজতিহাদের বৈধতা প্রমণে ব্যাপক ব্যবহৃত একটি হাদিস।

রাসুলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরাম রা.কে কিয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যেমন, হযরত উমর রা. যখন রাসুলুল্লাহ সা. নিকট স্ত্রীকে চুম্বনের কারণে রোজা ভঙ্গ হবে কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি যদি কুলি কর তাতে কি রোজা ভঙ্গ হবে? (ইবনে হাযম, ইহকাম)।

এখানে রাসুলুল্লাহ সা. উমর রা.কে কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক তুলনার মাধ্যমে রোজাদারের চুম্বন ও কুলি করার মিল বোঝালেন এবং দেখালেন যে ওটার মতো এটাও রোজা ভঙ্গ করবে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিম প্রতিভা

এহতেশামুল হক পাঠান

বিশ্বের সর্বশেষ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সা. এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন চির বিজ্ঞানময়। রাসূল সা. এর উপর অবতীর্ণ প্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াতের প্রথম শব্দটিই ছিল পড়ার তাগিদ দিয়ে "পড় তোমার প্রভুর নামে" এটি একটি বৈপ্লবিক বাণী। মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হলে তাকে অবশ্যই পড়তে হবে। অর্থাৎ তাকে শিক্ষিত হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমি মানুষকে কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছি। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় মুসলিম নর-নারী সবাইকেই শিক্ষিত ও জ্ঞানী হতে হবে।

এছাড়া আল-কুরআনের ৫৫৫টি আয়াত সরাসরি বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। আর আভাস-ঈঙ্গিতে আল কুরআনের এক পঞ্চমাংশই বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত। রাসূল সা. এর বহু হাদিস আছে যাতে তিনি সাহাবাদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন- "জ্ঞানীর এক ঘণ্টার সাধনা এক মাসের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম। জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ কর। জ্ঞানের প্রতি আল-কুরআনের বাণী ও রাসূল সা. এর তাগিদ মুসলিম জনগণকে জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করেছে। কোন শিক্ষিত যুদ্ধবন্দী থাকলে রাসূল সা. তাকে দশজন মুসলিম শিশুকে শিক্ষা দানের বিনিময়ে মুক্তি দিতেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বে ইসলাম আসার একশত বছরের মধ্যে মুসলিম মনীষীরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, নৌ-বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে তারা পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তারা বিশ্বের আনাচে কানাচে থেকেও জ্ঞান আহরণ করেন। সে সময় মুসলিম জাহান জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসরমান ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। তারা বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। মুসলিম শাসনামল বিজ্ঞান ও ব্যক্তিদের সকল প্রকার সহযোগিতা দিতেন। অথচ বর্তমানে তা শধুই কল্পনারবিষয় বৈই কিছুই নয়।

ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের মান মর্যদায় অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যযুগের মুসলমানরা জ্ঞানরূপ আলোকবর্তিকায় উদীপ্ত হয়ে আপন হৃদয়ে ধারণ করতে থাকনে। নিজেদের জ্ঞান সাধনার সাথে পৃথিবীর সব জ্ঞান ভাণ্ডারের আহরণ করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা লোহাকে সোনা করার অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যদিও তা সম্ভব হয়নি তথাপি এ গবেষণার সূত্রপাত করে নব উপাদান আবিষ্কারের। খলিফা মনসূর, হারুন-অর রশিদ, মামুন প্রমুখের সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের এহেন সাধনা চরমে পৌঁছেছিল। বাগদাদ, মিসর, স্পেন, পারস্য প্রভৃতি স্থান ছিল সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন বীজগণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষা লাভের প্রাণকেন্দ্র। সংক্ষেপে বলতে গেলে ইউরোপে যখন জ্ঞানের আলো পৌঁছেনি, তার অনেক আগেই আরববাসী জ্ঞান বিজ্ঞানে ছিলেন অনেক পারদর্শী। গ্রানাডার রাস্তায় যখন বাতি জ্বলত ইউরোপে তার দু'শ বছর পরে সে আলো পৌঁছে। রাসায়নিক শাস্ত্রকে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে উন্নত করতে মুসলিম বিজ্ঞানী আবির ইবনে হাইয়ানের অভূতপূর্ব অবদান। তার অক্লান্ত

পরিশ্রম ও সাধনায় সৃষ্টি হয় কিমিয়া বা ক্যামেস্ট্রির।

চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে ইবনে সিনার লিখিত গ্রন্থ "আল কানুন"কে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়। আল খারিজমির লিখিত "হিসাবুল জবর ওয়াল মুকাবল" গ্রন্থটি সর্বপ্রথম বীজগণিতের পাঠ্য-পুস্তকরূপে সমাদৃত হয়। পৃথিবী যে গোল তাও তিনি ১১৮৬ সালে তার রচিত "ক্ষুরাত আল আরদ" নামক গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ করে দেখান। এছাড়া ইবনে মুসা একাধারে গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক ছিলেন। ৮৫০ সালে তিনিই প্রথম মানচিত্রের ব্যবহার সবাইকে শেখান।

আরব নাবিক আব্দুর রহমানের সহায়তায় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন বলে জানা যায়। আরেক আরব নাবিকের দিকনির্দেশনায় ভাস্কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন।

আব্দুলাহ ইবনে আহাম্মদ ও ইবনে বতুতারা মুসলিম স্পেনে উদ্ভিদবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। আল মহিরাত, আল জারকালী ও আল ফরাজী সে যুগের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। ১০৬৮ সালে স্পেনের সাঈদ আলসাকি একটি "আন্টোলের" তৈরি করেন। যার দ্বারা বছরে সূর্যের গতিপথ নির্দেশিত এবং ২৮টি তারকার অবস্থান নির্ধারণ করেন। বর্তমানে এটি অক্সফোর্ড ইউনিভাসির্টির মিউজিয়াম "হিস্ট্রি অব সায়েন্সে" রক্ষিত আছে। খলিফা মামুন লোবের ছেলে কাতাকে আর্কিমিডিস, এ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখ গ্রীক মনীষীদের গ্রন্থগুলো অনুবাদের পদে নিযুক্ত করেন। গণিত, জ্যোতিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস নিয়ে গভীর সাধনা করেন আলবেরুনী। যে মুসলিমবিশ্ব মধ্যযুগে সমগ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বকে জ্ঞানে আলো দান করেছেন। অদৃষ্টের পরিহাসে আজ সেই মুসলিম বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাদের না আছে লেখাপড়া, না আছে জ্ঞান সাধনা। বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত জাতি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাদের দারিদ্র, অশিক্ষা, অলসতায় ঘিরে আছে। ইউরোপ, স্পেনের গ্রানাডা, কর্ডোভা ও আন্দালুস থেকে জ্ঞান শিক্ষা ইউরোপকে আলোকিত করেছে।

আজকে আমরা তল্পিবাহক। আমাদের আল-কুরআন ও হাদিসের দিকে ফিরে যেতে হবে। জ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করতে হবে। মুসলিম ছাত্র যুব সমাজকে জ্ঞান শিক্ষায় আলোকিত করতে হবে। এর জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম ও বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠার সাধনা।

লেখক: কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন।

রচনা

ইসলামপন্থিদের চেতনা সংকট

মুহাম্মাদ রাসেল উদ্দীন

আজ আমাদেরকে; গোটা মুসলিম উম্মাহকে ঘৃণা ও অমর্যাদার চোখে দেখা হচ্ছে। আমাদের পবিত্র ইসলামকে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা চলছে। ইসলামের মহান সংস্কৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায়। আমাদের সংস্কৃতিসেবীরা অপসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে যেন ঠিকাদারী হাতে নিয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকতো দূরের কথা, মিউজিয়ামেও স্থান পাচ্ছে না ইসলামের সু-মহান ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক দর্শন। ইসলামপন্থি মনীষীদের চিন্তাধারা বিকৃতভাবে মুসলিম উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুনিপুনভাবে জাতির চেতনায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ধর্মের উপর অনাস্থা, স্বদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার মনোভাব।

অথচ আমরা- ইসলামপন্থিরা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে ইসলামী রাজনীতিকে বক্তব্য, বিবৃতি ও মিছিল-মিটিং নির্ভর করে তুলেছি। আবার অনেকে ক্ষমতার রাজনীতি করতে গিয়ে লেজুড়বৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে। যার ফলে স্বতন্ত্র ধারায় ইসলামের পুনর্জাগরণের পথ বার বার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। জনগণের সেন্টিমেন্টে ইসলামপন্থিদের ব্যাপারে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। সত্যিকারার্থে যদি আমরা ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন লালন করে থাকি, তবে সর্বপ্রথম ইসলামী সংস্কৃতির বিপ্লব ঘটাতে হবে।

জনগণের চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা ও চাহিদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। যেখানে অপসংস্কৃতি জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছে, ইসলামী রাজনীতির উপর জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে ইসলামপন্থিদের অবস্থান সভা-সমাবেশ নির্ভর। বড়জোর অপসংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও দু'একটি ফতোয়া বা বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত রয়েছেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে একতরফাভাবে ইসলামবিদ্বেষীদের হাতে তুলে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছেন।

পানি পিপাসায় কাতর ব্যক্তিকে যদি পানির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে সে দুষিত ও জীবাণুযুক্ত পানি পান করবে এটাই স্বাভাবিক। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এ ফতোয়া তখনই কার্যকর হবে, যখন সুস্থ সংস্কৃতি জাতির সামনে তুলে ধরা হবে। আজকে কবিতা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলা হয়েছে। চিন্তা-চেতনায় যুক্ত করা হয়েছে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ভোগবাদিতা, প্রতারণা ও অবৈধ প্রণয়। একটি জাতির সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কালচার ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠে। যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্রে অধিকাংশই হিন্দুদের দেব-দেবীর পূজার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অথচ আমাদের দেশের কোন চলচ্চিত্রে ইসলামী সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। বরং পশ্চিমা সংস্কৃতির ভাবধারায় অশ্লীলভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। যার প্রভাবে শহর থেকে পাড়া-গাঁ পর্যন্ত সর্বত্র অশ্লীলতার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামপন্থি মানেই সেকেলে, দরিদ্র, পরনির্ভর ও সংকীর্ণমনা- এ জাতীয় মনোভাব তৈরি হয়েছে। যার ফলে মুসলমানের ঘরেই সৃষ্টি হচ্ছে ইসলামবিদ্বেষী।

মুসলিম উম্মাহকে এমন দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত রেখে আদৌ ইসলামী বিপব ঘটানো সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ইসলামের সু-মহান ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক দর্শনকে জাতির সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব ইসলামপন্থিদেরকেই নিতে হবে। আলিফ লায়লার মত অবাস্তব কল্প-কাহীনিতে মনুষ্য হিংস্র প্রাণী, অজগরের মত ভয়ংকর সাপের দৃশ্য প্রদর্শন করে মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীতু করে তোলা হয়েছে। টম এন্ড জেরীসহ বিভিন্ন কার্টুনের মাধ্যমে শিশুদের চেতনার বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। সম্প্রতি ভারতীয় চ্যানেল স্টার জলসার অবাধ প্রদর্শনের মাধ্যমে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

অতএব স্রোতের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে নির্মাণ করতে হবে ইসলামী চলচ্চিত্র, নাটক ও মুভি। যেখানে ফুটে উঠবে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রমাণ করবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রদর্শন করবে ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত চিত্র। ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সাহিত্যিকদের সচেতনতার সাথে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত, সঠিক ও সত্য কিচ্ছা কাহীনি রচনা করতে হবে। যাতে বাস্তব সাহিত্য, নাটক-গল্প ও কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে অশীল, নোংরা, ভ্রান্ত কাহীনি আর নাটকীয় চিত্র ধোঁয়া আর মরীচিকার ন্যায় বিলীন হয়ে যায়।

অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতা, একগুয়েমি ও পিছুটানের কারণেই ইসলামী সভ্যতা, সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার কারণে মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সন্তানদের অন্তরে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নানা ধরণের ভীতির সঞ্চার ও ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভিতরে আবার ঈমানী স্পৃহা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হলে এবং সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যোগ্যতা ও সাহসিকতা তৈরি করতে হলে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে সকল প্রকার অপসংস্কৃতি, কল্প-কাহীনি, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি মুক্ত করতে হবে। ধারালো লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারার কবিতা, সাহিত্য রচনা করতে কলম হাতে নিতে হবে আমাদেরকেই। উলামায়ে কেরাম যদি নিজেদের উপর দেশ ও জাতি গঠনের দায়িত্ব অনুভব করেন, তাহলে বর্তমান পরিস্থি'তি অনুধাবন করে সময়োপযোগী পরকিল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

লেখক: প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, ঝিনাইদহ জেলা শাখা।



স্পেনে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মুহাম্মদ ইবরাহীম হোসাইন

স্পেনের পরিচিতি : মধ্যযুগীয় ইউরোপের অগ্রযাত্রায় স্পেনই পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। স্পেন তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিতে। পূর্ব দিকে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে জিব্রাল্টার প্রণালী ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। স্পেনের সাথে ফ্রান্সের যে ভূখণ্ড সংযোগ রক্ষা করেছে তা হচ্ছে পিরেনীজ পার্বতমালা যা প্রায় তিনশত মাইল পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। স্পেনের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের উপকূল পর্বতমালা দ্বারা আবৃত থাকলেও এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারাগোনা, কাসটেলন ভ্যালেসিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী সমুদ্রপথ ছিল। স্পেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি মেসেটা নামে পরিচিত।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত স্পেন আইবেবিয়ান উপদ্বীপের ৮৫ ভাগ ভূমি দখলকরে আছে। স্পেনের বর্তমান আয়তন ১,৯৪,৯০০ বর্গমাইল বা ৫,০৪,৭৮২ বর্গকিলোমিটার, স্পেন মুসলিম আমলে আন্দালুস নামে পরিচিত ছিল।

স্পেনে মুসলমানদের আগমনের পটভূমি : গথিক রাজাদের অধীনে প্রায় ৩০০ বছর, স্পেনে জনগণের কোনো কল্যাণ হয়নি বরং তারা ছিল নানা সমস্যায় জর্জরিত। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারে ভূমিদাস, ক্রীতদাস, বর্গাদার ও ইহুদিদের মধ্যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক অবস্থা এক চরম পর্যায় উপনীত হয়। এরূপ নাজুক ও ভয়াবহ অবস্থায় উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা আলওয়ালিদের শাসনামলে স্পেনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ ও মুসা বিন নুসাইর। মুসলমানদের অভিযানে আগমনের পূর্বে স্পেনে কেন্দ্রীয় শাসন ছিল খুবই দুর্বল। রাজ পরিবারগুলোর মধ্যে গোত্রীয় কলহ, যা সমগ্রিকভাবে রাজনৈতিক অবস্থাকে দুর্বিষহ করে তোলে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে গথিক রাজা রডারিক পূর্ববর্তী রাজা উইটিজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে, ফলে উইটিজার ভ্রাতা, পুত্র, জামাতা সবাই বিরোধী হয়ে ওঠে।

অপরদিকে কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফোরিন্ডা রাজা রডারিক কর্তৃক শ্লীলতাহানির শিকার হন, যার ফলে কাউন্ট জুলিয়ান রাজা রডারিকের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম গভর্নর মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানায়। তবে মুসলমানদের স্পেনে আগমনের ক্ষেত্রে তৎকালীন ধর্মীয়ব্যবস্থাও অনেক সুযোগ করে দিয়েছিল। তৎকালীন স্পেনের রাজা আদেশ জারি করেছিল যে, ইহুদিগণ হয় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবে, নতুবা স্পেন ত্যাগ করবে। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ৬১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৯০ হাজার ইহুদিকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

স্পেন বিজয়ের বিবরণ : প্রথম অভিযান হলো সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান ও উত্তর আফ্রিকার স্পেনীয় উদ্বাস্তুদের অনুরোধে মুসা বিন নুসাইর স্পেনের প্রাথমিক অবস্থা জরিপের জন্য অধিনস্ত সেনানায়ক তারিক বিন যিয়াদকে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে চারখানা যুদ্ধজাহাজে স্পেনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারিক কার্য সমাধা করে

প্রত্যাবর্তন করেন এবং অভিযান পরিচালনার অনুকূলে রিপোর্ট পেশ করেন।

দ্বিতীয় অভিযান হলো উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা ও সামরিক অধিনায়ক মুসা ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে সাতহাজার সৈন্যর একটি বাহিনী দ্বিতীয় বারের মতো স্পেন বিজয়ের প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বারো হাজারে পৌঁছে। কাউন্ট জুলিয়ান কর্তৃক প্রেরিত চারটি জাহাজে তারিক জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণ করেন। তবে তারিক যে স্থানে ঘাটি স্থাপন করছিলেন তা আজও জাবালুত তারিক নামে পরিচিত। তিনি আন্দালুসিয়ার দক্ষিণাঞ্চল দখল করেন। অতপর ৭১১ সালে ১৯ জুলাই মূলবাহিনী রডারিকের একলাখ সৈন্যর মোকাবিলা করে ওয়াদী লাক্কের নিকটবর্তী সারিস বা জেরেখে মুসলিম ও গথিক বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধ ইতিহাসে ওয়াদী লাক্কের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ রাজা রডারিক শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। এ অভিযানে স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজধানী কর্ডোভার এবং মূল রাজধানী টলেডোর পতন ঘটে।

সেনাধ্যক্ষ মূসা ও তারিকের যৌথ অভিযান : মূসা ৭১২ সালে তারিকের অধিকৃত অঞ্চল ব্যতিরেকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত শহরগুলোর দিকে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি তার আঠারশত সৈন্যসহ অতি সহজে মেদিনা, সেভিল, মেরিদা দখল করেন। এরপর তারিক ও মূসার সম্মিলিত বাহিনীর অভিযানে লিও, গ্যালিসিয়া ও স্যরাগোসা মুসলিম অধিকারে আসে, তারপর তারা আরাগানে উপস্থিত হয়ে লিজিও আমিয়া অধিকার করেন। মাত্র দুই বছরে সমগ্র স্পেনে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রডারিকের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে স্পেনে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের পর অল্পদিনের মধ্যে স্পেন দামেস্কের উমাইয়া খেলাফতের অধীনে চলে আসে। অবশেষে এভাবে ধারাবহিক ভাবে স্পেনে খলিফাগণ খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এবং ৭৫০ সালে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়াদের পতন হলে, আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম দিকে আব্দুর রহমান আদদাখিল নামক এক ব্যক্তি দামেস্ক থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে গিয়ে স্পেনে আশ্রায় গ্রহণ করেন। এবং সেখানে তিনি অবস্থান করার পর স্বাধীনভাবে আবার উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, অবশেষে ধারাবাহিকভাবে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলে স্পেনে মুসলিম আধিপত্য চলতে থাকে।

লেখক : প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ইশা ছাত্র আন্দোলন, বরিশাল জেলা।



দেশে-দেশে সহিংসতা আদর্শিক না সন্ত্রাস

ইঞ্জিনিয়ার মোস্তাক আহমেদ

ক্যানিবালিজম নামক গ্রন্থে মনটোয়েন লিখেন- মৃত্যুর পর মানুষকে ভেজে খেয়ে ফেলার চাইতে, জীবিত মানুষকে খেয়ে ফেলা কিংবা সজ্ঞান ও সচেতন মানুষকে নির্যাতন নিপীড়ন চলানো অনেক বেশি বর্বর কাজ। ইদানিং আমরা এর চেয়ে শতগুণ বেশি বর্বরতা লক্ষ করেছি সারা পৃথিবীর দেশে দেশে সন্ত্রাসীদের সহিংস হামলাগুলোতে। অতি সেকুল্যার ফ্রান্স থেকে নব্য ইসলামমুখী তুরস্ক কিংবা আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের গুলশান ও শোলাকিয়া থেকে আমার প্রিয় মহানবী সা.-এর পবিত্র ভূমি মদিনা পর্যন্ত যে সহিংস হামলাগুলো হল- তাতে আমরা সন্ত্রাসের একটা বৈশ্বিক রূপ দেখলাম। নির্মমতা কাকে বলে দেখলাম। দেখলাম সেখানে পৈশাচিকতা কাকে বলে। তাতে দেখলাম জঘন্য বর্বর হত্যাযজ্ঞ কত ধরনের হতে পারে। তাতে এও দেখলাম আতংকিত হলে মানুষ কত অসহায় হতে পারে। এককথায় নিরাপরাধ মানুষের দেহ নিয়ে, প্রাণ নিয়ে রক্তের এক হোলি খেলার উৎসব দেখলাম। আজকে দেশে দেশে যে সহিংস হামলাগুলো হচ্ছে এইগুলোকে স্রেফ সন্ত্রাস বলতে হবে।

আজকাল সন্ত্রাসী হামলা কেমন যেন সন্ত্রাসীদের ফ্যাশানে পরিনত হয়েছে। সে এক আজব ব্যাপার। সন্ত্রাসী হামলাগুলো যারা করছে- তাদেরকে কেউ বলেন সন্ত্রাসী, কেউ বলেন জঙ্গি, কেউ বলেন উগ্রবাদী, কেউ বলেন চরমপন্থী, কেউ বলেন মৌলবাদী, কেউ বলেন বিপদগামী, কেউ বলেন গোড়ামী আবার কেউ বলেন বোমাবাজ, কেউ বলেন আততায়ী, কেউ কেউ বলেন ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি ইত্যাদি। যে যা বলুক, আমরা বলবো- এরা উগ্রবাদী। আর উগ্রপন্থীর অপরনাম সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাসীই তাকে আর কীবা বলা যায়।

এখন পর্যন্ত বিশ্বে সন্ত্রাসের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়নি। আসলে সন্ত্রাস একটা আপেক্ষিক বিষয়। মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ ফেকাহ পরিষদ 'মুজাম্মাউল ফেকহিল ইসলামী'র প্রথমসারির মুফতিগণ সন্ত্রাসের একটা ব্যাখা দিয়ে বলেন- অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তি, দল অথবা রাষ্ট্র যদি অন্য কোন ব্যক্তির জান-মাল বা ইজ্জতের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করে, শক্তি প্রয়োগ করে, ত্রাস সৃষ্টি করে এটাই সন্ত্রাস। বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হল- পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন সন্ত্রাসী হামলা হলেই পশ্চিমরা আর তাদের দোষারূপ ইসলাম ও মুসলমানদের দিকে প্রথমে আঙ্গুল উঁচু করে দোষারূপ করার অপচেষ্টা চালায়।

মনের রাখতে হবে, ধর্ম কখনো সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। ধার্মিক ব্যক্তিত্ব কখনো সন্ত্রাসী হয় না। আবার সন্ত্রাসীও কখনো ধার্মিক হয় না। আর সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম নেই বরং সন্ত্রাস হলো তাদের আসল ধর্ম। দয়া-মায়াহীন পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিরাই মূলত এইসব সন্ত্রাস করে থাকে। বিশেষ করে ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। মহাকবি আল্লামা ইকবাল রহ: এর ভাষায়- 'উনহিকা মাহফিল সাঁওয়ার তা হু, চেরাগ মেরি হ্যায় রাত উনকি, উনহিকা মতলব কাহ্‌রাহা হুঁ, জবা মেরী হ্যায় বাত্ উনকি'। অর্থাৎ- এই অনুষ্ঠান আমার নয়, অন্যজনের আর অন্যজনের রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য আমি আমার প্রদীপ জালাই। অন্যজনের রাতেরই অন্ধকার দূর করার জন্য আমি আমার জিহ্বা ব্যবহার করি। আসলে ইসলাম আমাদেরকে দয়া মায়া-মমতা শেখায় আর সহনশীলতা শেখায়।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ড. খুরশিদ আহমদ 'গোড়ামি অসহনশীলতা ও ইসলাম' গ্রন্থে লিখেন- ইতিহাস বলছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মহীন শাসনাধীনে অসহনশীলতা অধিকতর ভয়াবহ। অধিকতর সন্ত্রাসদের এবং অধিকতর অমানুষিক রূপ ধারন করে। এই সত্যের সামনে ধর্ম অসহনশীলতার জন্ম দেয়। এই যুক্তি আর পালে বাতাস পায় না।

ড. এন. কে সিংহ তার 'ইসলাম: এ রিলিজিয়ন পিস' গ্রন্থে লিখেন ইসলাম সহিংসতার ধর্ম নয়। সহিংসতা ইসলামের

অংশ নয়। ইসলাম শব্দটি সহিংসতার ধারনাকে অস্বীকার করে। একজন সত্যিকার মুসলিম মহান আলহর হুকুমের সামনে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বেঁচে থাকে আর মৃত্যুবরণ করে। মূলত সন্ত্রাসী হামলা করে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা আর আতংক সৃষ্টি করা ইসলামে একেবারে নিষিদ্ধ।

পবিত্র কোরআনে বলা আছে- একজন মানুষকে হত্যা করা মানে পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করা এক সমান বুঝায়। মহান আল্লাহ পবিত্র কালামেপাকে বলেন (বৈধ কারণ ব্যতীত) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করলো। আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করলো (সূরা মায়িদা)।

বিশ্বনবী সা. হাদীসে পাকে বলেন- মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অবস্থানকারী ফেরশতাদের চাইতেও সম্মানিত। অন্য কোনো মুমিন ব্যক্তির রুহের বিনিময় ব্যতীত তাকে হত্যা করা অপেক্ষা দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অনেক সহজ। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে কিংবা পৃথিবীর কোণায় কোণায় হতে পারে, পৃথিবীর মধ্যখানে যে সকল সন্ত্রাস হচ্ছে- সকল সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে ইসলামে জিহাদের বিধান রাখা হয়েছে। আজকে সেই পবিত্র জিহাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তি, তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা আর প্রাচ্যবিদরা যে সকল অপপ্রচার চালাচ্ছে অপবাদ দিচ্ছে তাকে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও সাবেক কনজার্ভেটিভ এমপি লর্ড নরম্যান বলেন- আমি মনে করি না ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোন যোগসূত্র আছে। আমি মনে করি, জিহাদ শব্দটি ভ্রান্তভাবে বুঝা হচ্ছে। জিহাদের দুটি অর্থ হতে পারে। এক. ইসলাম হুমকির কবলে পড়লে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য পরিচালিত যুদ্ধ। দুই. জিহাদ একটি অধ্যাত্মিক বিষয় নফসকে কাবু করা এবং আরো ভালো ব্যক্তি হওয়ার চেষ্টা করা।

আসলে জিহাদ ইসলামে মহান আল্লাহর পবিত্র বিধান। আমাদের মহান পবিত্র ইবাদত। যতই গুজুব ছড়াক ওরা, আমরা বলব- সন্ত্রাসের সাথে জিহাদের নিকটতম সম্পর্ক বাদই দিলাম বরং দূরতম সম্পর্কও নেই। আর সন্ত্রাস থেকে জিহাদ শুধু দূরে নয়, বলতে গেলে যোজন যোজন দূরে। আসল কথা হল, জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয় আর সন্ত্রাসও কখনো জিহাদ নয়। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমরা যেভাবে নির্যাতিত নিপড়ীত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে সেখানে যদি একজন মুসলিম কিশোর আমার সাথে একটি ঢিলও ছুঁড়ে তাহলে সেই হয়ে যায় জিহাদী, সেই হয়ে যায় সন্ত্রাসী যোদ্ধা কিংবা সে হয়ে যায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী।

সাহিত্যিক আবু জাফর 'অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা" বইয়ে খুব সুন্দর উদারহরণ দিয়ে লিখেছেন- অসংখ্য ফুলে-ফলে পরিভ্রমণ করে বহু পরিশ্রমে মৌমাছি তার মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে রাখে। নির্দয়, দস্যুর মতো বাওয়ালি যখন মৌচাকে হানা দেয়, ক্ষুদ্ধ রাগান্বিত মৌমাছি তার মধু ও মৌচাক রক্ষা করতে যদি বাওয়ালিকে দংশন করে। সেটা কি সন্ত্রাস? আসলে কে সন্ত্রাসী? দস্যু বাওয়ালি, নাকি বিক্ষুদ্ধ মৌমাছি? কী অদ্ভুত পরিহাস। পাশ্চাত্যের বাওয়ালি মুসলিম বিশ্বের সর্বস্ব লুণ্ঠনে মেতে উঠবে, (যা দেখে ইবলিসও লজ্জা পায়)। তারা নিষ্পাপ নিরাপরাধ! আর যারা আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ করবে তারা সন্ত্রাসী!!

এক উর্দুকবির ভাষায়- 'ও কতল ভি কয়াত চর্চা নাহি হোতা, হাম আহভি করয়িত বদনাম হো জা তা'। অর্থাৎ- সে খুন করে কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ তার সমালোচনাও করে না। আহত হয়ে যন্ত্রণাকাতর শব্দ আমার মুখে উচ্চারিত হলেই চারদিকে আমার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

অন্য ধর্মের লোকের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টাই দেখি, সৈয়দ আবুল মাকসুদ প্রথমআলোর এক উপসম্পাদকীয়তে লিখেন- নরওয়ের স্যাভার্স ব্রেইভিক যখন উটোয়া দ্বীপে নরওয়েজিয়ান লেবার পার্টির খুবক্যাম্পে বন্ধুক থেকে গুলি ছুঁড়ে ৭৭ জনকে হত্যা করে, তখন সরকার বলল- সে ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী, খ্রিষ্টীয় মৌলবাদের নামটিও উচ্চারণ করা হলো না, যদিও যুবকটি খ্রিষ্টান মৌলবাদী ও মুসলিমবিদ্বেষী। পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই দ্বিমুখী নীতি থেকে আমাদের সহসাই বেরিয়ে আসা উচিত। না হলে শান্তি সদূর পরাহত।

মধ্যপ্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী একজন তার আচারণে গোড়ামি ও সহিংসতা' গ্রন্থে এর একটা কারণ ব্যাখা করে লিখেন- বর্তমান যুগের গোড়ামি, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী আন্দোলন তা কখনো কম্যুনিস্ট বা সমাজতন্ত্রের রূপ ধারন করেছে। কখনো জাতীয়তাবাদের, কখনো ধর্মীয় পরিচয়ের তাই আমরা সহিংস আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকতে পারি না। যেমন- ইতালির লালবর্ণের আন্দোলন, জার্মানির বাছের সাইনহোফের আন্দোলন, জাপানের আউসের আন্দোলন, উত্তর আইরল্যান্ডের গণতন্ত্রিক দলের আন্দোলন, স্পেপেনের কয়েক জেলার ঈতা সংগঠনের আন্দোলন, ইউনানের ১৭ নভেম্বরের আন্দোলন, ভরতের উগ্রবাদ হিন্দুদের আন্দোলন, দক্ষিণ আমেরিকার বাম বিপ্লবীদের আন্দোলন বরং আমেরিকাতে ৫১টির মত সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে। আমরা এখানে তাদেরকে একথা বুঝাতে চাচ্ছি যে, এটা (সন্ত্রাসবাদ) কোন জাতি বা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের সাথে ও সম্প্রদায়ের মাঝে এ গোড়ামির অস্তিত্ব রয়েছে।

খ্যাতিমান চিন্তাবিদ আজিজুল হক বান্না এক প্রবন্ধে বলেন- কতক মূসলমান, যারা আত্মঘাতী বোমা হামলার স্বারথী হয়েছেন কিংবা চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন তার পিছনে পশ্চিমা শক্তির প্ররোচনা ও অবদমন নীতির হাত রয়েছে।

ইসলাম সাধারণভাবে কোন নিরপরাধ মানুষ হত্যা বা সম্পদ বিনষ্টের অধিকার দেয় না। সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নিরূপণ না করে সন্ত্রাস বা চরমপন্থার জন্য ইসলামকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো পশ্চিমাদের একটা কৌশল।

আজ পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন অঘটন ঘটলেই মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই আর ইসলামের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্রের আঁচও পরিলক্ষিত হয়। আসলে পৃথিবীর বুকে দ্রুত বিস্তারকারী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আর জ্যামিতিক হারে বাড়ছে পৃথিবীতে মুসলিমদের সংখ্যা। ১৯৮৬ সালের রীডার্স ডাইজেস্টের এক পরিসংখ্যান মতে পৃথিবীতে ইসলাম বেড়েছে ২৩৫% হারে। আর খ্রীষ্টবাদ বেড়েছে মাত্র ৪৭% হারে।

সবচেয়ে বড় কথা ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। আর ইসলামের যে সারা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা আছে সে অনেক আগেই পরিক্ষীত। এসব কারণেই আজ পশ্চিমাদের বড় মাথাব্যথা। পশ্চিমাদের গুরু সামুয়েল পি হাটিংটন একটি বই লিখে তাদের মাথা ব্যথা আরও বাড়িয়ে দিলেন। হাটিংটন হলেন আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক পরিচালক। এছাড়া আমেরিকার রয়েল পলিসি নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠিতা ও কো-এডিটর। তিনি ১৯৯৭ সালে The Clash of Civilization and the Remaking of Word order অর্থাৎ সভ্যতার সংঘাত ও পৃথিবীর পুনর্গঠন নামক একটি বই লিখেন। উক্ত বইটি আমাদের মাঝে The Clash of Civilization অর্থাৎ সভ্যতার সংঘাত নামে বেশি পরিচিত। পৃথিবীতে এটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর সারা পৃথিবীর মানুষ নড়েচড়ে বসে। আর ইহুদী সরকার ইহুদী প্রভাবিত বিশ্বেরনেতা ও বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ করে ইহুদী প্রাভাবিত পত্রিকাগুলো বইটির প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে, উক্ত বইয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকা তথা পশ্চিমাদের পরামর্শ দিয়ে হাটিংটন লিখেন- ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমেরিকার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে সারা বিশ্বে সার্বজনীন সম্মান মর্যাদার আমলে আসীন হয়েছে। বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী আমেরিকাই পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দুনিয়ার সকল জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে এক বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এই সভ্যতা বর্তমানে সারা দুনিয়ার ওপর বিজয়ী হয়েছে এবং সকলেই এর দ্বারা প্রভাবিত। সমাজতন্ত্রের পতনের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্র সারা দুনিয়ার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম, ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহ যে গতিতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি বিশেষ, পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্ব গড়ার পথে ইসলামই একমাত্র শক্তি, যা পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্র ছিলো একটি সাময়িক সমস্যা বিশেষ, এখন তা শেষ, কিন্তু ইসলাম গত ১৫শত বছরব্যাপী স্বকীয় শক্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম বেশ শক্তিশালী বলেই প্রমাণ হচ্ছে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে এর সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে যারা দুনিয়াকে গড়তে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং ইসলামের উত্থানকে যে কোন প্রকারে প্রতিহত করার পরিকল্পনা এখন গ্রহণ করতে হবে।

হাটিংটনের কথামতে পশ্চিমারা অজা সারা পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমেছে। মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষ্যে একের পর এক ষড়যন্ত্রের ছক আঁকছে। মুসলিমদের সাজানো বাগানগুলো উচ্ছেদ করে ফেলা হচ্ছে। যেসব মুসলিম দেশ সভ্যতার পরীস্থান যেগুলোকে বার বার ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। যেসব মুসলিম দেশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে আর দেশে উন্নয়ন করছে, সেগুলোকে পিছন দিক থেকে লাগাম টেনে ধরা হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর ভিতরে আজ উগ্রপন্থী সৃষ্টি করা হচ্ছে, গ্রুপ উপগ্রুপ কিংবা দল- উপদল সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধে একচেটিয়া অপ্রচার চালাচ্ছে।

কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় এক উপসম্পদকীয়তে লিখেন- দেশে দেশে কিছু দেশীয় উগ্রবাদী ও জঙ্গি থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি তৎপরতার রূল উৎপত্তিস্থল আফগানিস্তান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ। যুগ যুগ ধরে পশ্চিমা শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার শিকার এই অঞ্চলের মানুষেরা। অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার হতে হতে তাদের জীবনে একপ্রকার হতাশা চলে আসে। এই হতাশাটি তাদেরকে উগ্রপন্থার দিকে টেনে নেয়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরিসহ অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, দেশে সুশাসনের অভাবেই উগ্রবাদ সৃষ্টি হয়, আবার অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, আমেরিকা নিজের অস্ত্র ব্যবসা টিকিয়ে রাখার সাথে দেশে দেশে উগ্রবাদ সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, গত ৬ই জুলাই ২০১৬ তারিখে যুক্তরাজ্য প্রকাশিত চিলকট রিপোর্টে বলা হয়- ইরাক যুদ্ধ বেআইনী ও অন্যায় ছিল, ভুল তথ্য উপস্থাপন করে পশ্চিমা শক্তি ইরাক নামক সাজানো গোছানে সুন্দর দেশটাকে মৃত্যুপুরীতে পরিনত করে ফেলল। মুসলমানদের ক্ষতি তো হলোই আরও অপূরণীয় ক্ষতি হল সারা বিশ্বের, সিরিয়া, ইরাকের এই ধ্বংসস্তুপ থেকেই সারাজাহানের আতংক তথাকথিত আইএস সৃষ্টি করা হল, লাভটা কী হল? হয়তোবা যারা অসৎ ব্যবসা করে তাদের লাভ হচ্ছে। কিন্তু ঐদিকে সারা পৃথিবীর মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের দেখাদেখি আরও বিভিন্ন দেশে উগ্রবাদী

সংগঠন সৃষ্টি হচ্ছে।

সাপ্তাহিক নেশন পত্রিকার ভাষ্যকার ইউসুফ মুনাওয়ার এর মতে গনগনে চুলায় পানি গরম করতে গেলে তাতে এক সময় বুদবুদ দেখা দেবে। জঙ্গিবাদ হলো ওই বুদবুদদের মতো। এই উগ্রবাদীরা ইসলামের অপব্যাখা করে বেহেশত পাওয়ার ভুল আশ্বাস দিয়ে স্বপ্নবাজ তরুণদের কৌশলে মগজ ধোলাই করে বিপদগামী করেছে আর উগ্রবাদী হতে সাহায্যে করেছে।

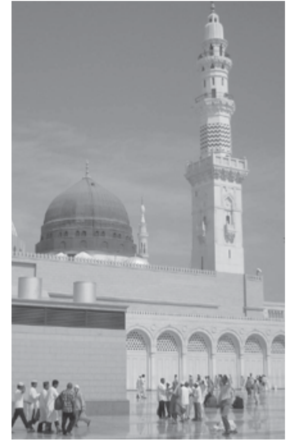
সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ ড. স্ট অ্যাট্রনের মতে- বিদেশি জঙ্গি যোদ্ধাদের ৯৫ শতাংশ পরিবার ও বন্ধুদের মাধ্যমে আইএস নিয়োগ করছে, তাদের তারা মসজিদ থেকে নেয়নি, তাহলে বোঝাগেল, এসব জঙ্গিরা ইসলামের কেউ নয় বরং ইসলামের বড় দুশমন। ইসলামের সাথে এই উগ্রবাদীদের সম্পর্ক আছে বললে মারত্মক ভুল তো হবেই যাকে বরং সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। অথচ অন্যদিকে সন্ত্রাসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে অন্য কথা বলছে। ইতিহাসে আছে, খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের হাতে বিংশ শতাব্দীতে বিশ কোটি মানুষ খুন হয়েছে।

লোন ওয়াচ ডটকম নামক ওয়েব সাইটের পরিসংখ্যান মতে ইউরেপীয় ইউনিয়নে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দশমিক ৪ শতাংশ মুসলিমদের দ্বারা আর ৯৬ ভাগ অমুসলিমদের দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে। ১980 সাল থেকে ২005 সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যত সন্ত্রাসী হামলা ঘটেছে তার ৬ শতাংশ মুসলিম আর ৪২% ল্যাটিন, ২৪% বামমনা, ৭% ইহুদী, ৫% সমাজতন্ত্রী ও ১৬% অন্য চরমপন্থী গ্রুপগুলো দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

ইহুদিমালিকানধীন ‘ইকোনোমিকস’ পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পৃথিবীতে গত শতাব্দীতে বা বর্তমানে যে সব সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, গুলোতে ৬০ ভাগ অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে আমেরিকার। আর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ হলো সন্ত্রাসী হামলাগুলোর অর্থ, প্রশিক্ষণ ও মূল মদদদাতা।

সুন্দর এই পৃথিবীতে আসলে সন্ত্রাসের জন্মদাতা, আশ্রয় প্রশয়দাতা ও ইন্ধনদাতা হলো কুটিল ইহুদিজাতি। জারজ ইহুদিদের কালো হাত আজ নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের রক্তে রঞ্জিত। ইহুদি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মধ্যে ওয়ার্ড জায় লিকট অরগানাইজেশন, ফ্রীম্যামন, হেগনা, ইরগুল, জীউইম, এজেন্সী কাহাল, জামেয়া ইয়াহুদীয় ইত্যাদি নামে সভ্যতা বিধ্বংসী সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, বিভিন্ন মতবাদ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই রয়েছে এই ইহুদিরা। সেটা হোক পুঁজিবাদী, হোক সমাজতন্ত্র কিংবা হোক না অন্য কোন মতবাদ, কুটিল ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের কারণে এই ইহুদি জাতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ থেকে বিতারিত হওয়ার একটা চিত্র আছে। ইংল্যান্ড থেকে ১২৯০ সালে, ফ্রান্স থেকে প্রথমে ১৩০৬ সালে, দ্বিতীয় বার ১৩৯৪ সালে, বেলজিয়াম থেকে ১৩৭০ সালে ইতালি থেকে ১৫৪০ সালে, জার্মানি থেকে ১৫৫১ সালে বিতারিত হয়। আর হিটলার তাদেরকে পাইকারীহারে হত্যা করে। এই হলো কলংকিত জাতির কলংকিত ইতিহাস।



আর মাওবাদী, লেনিনবাদী, বামপন্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অঘোষিত সন্ত্রাস-সংগ্রামের মাধ্যমে উগ্রবাদী তথা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যাদের হাতে অগণিত নিরীহ মানুষের অকালে প্রাণ ঝরছে, যা বর্ণনার বাইরে। যাক, অতীত ইতিহাসের এই জাতীয় পৃষ্ঠাগুলো উল্টালে আর প্রতিদিনকার ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘনাবলী বিশ্লেষণ করলে মুসলিম হিসেবে নিজের প্রতি নিজের বেশ করুণা হয়। মনে মনে ভাবি, যতদোষ নন্দঘোষ। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের সাথে মনের অজান্তেই কখন যে মুখে দিয়ে বের হয়ে যায়- আহরে মুসলমান!

বিপ্লবী সংগীতশিল্পী আইনুদ্দীন আল আজাদ রহ. ঠিকই গেয়েছেন- সন্ত্রাস কাকে বলে জানকি? ওরাই দেশের সব মান কি? আসলে মূসলমানরা হয়তো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার নয়তো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের শিকার। আপাতত এটাই আমাদের ভাগ্যের লিখন বলে বলা যায়। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, কোন মুমিনের আদর্শ সন্ত্রাস নয়, কোন মুসলমানের আদর্শও সন্ত্রাস নয়। সর্বপ্রকার ইসলামের আদর্শও সন্ত্রাস হতে পারে না। এখানে বলে রাখা ভালো, সন্ত্রাসীদের কোন আদর্শ নেই বরং সন্ত্রাসই হল তাদের মূল আদর্শ। তবে চরমপন্থীদের আদর্শ সন্ত্রাস হতে পারে বামপন্থীদের আদর্শ সন্ত্রাস হতে পারে, নৈরাজ্যবাদীদের আদর্শ সন্ত্রাস হতে পারে কিংবা খারিজীবাদীদের আদর্শ সন্ত্রাস হতে পারে। কিন্তু কোন ইসলামী সংগঠন বা দলের আদর্শ সন্ত্রাস হতে পারে না। সন্ত্রাসের সাথে তাদের নাম জড়িয়ে ফেলা এটা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামী দলগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামী হুকুমতে বিশ্বাসী, অস্বাভাবিক পন্থা তথা সন্ত্রসী পন্থায় ইসলামী হুকুমতে তারা বিশ্বাসী নয়। পশ্চিমা নেতা আব্রাহাম লিংকনের নিচের কথা দিয়ে শেষ করছি- তুমি সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পার এবং কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তুমি সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পার না।



কেন্দ্রীয় সংগঠন সংবাদ



ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা সন্ত্রাসবাদের অন্যতম কারণ

-ইশা ছাত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় মাজলিসে শুরা অধিবেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফের সঞ্চালনায় ২৩জুলাই ১৬ শনিবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে শুরার নেতৃবৃন্দ দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ের সন্ত্রাসবাদ দেশের একটি মৌলিক সমস্যা। সকল শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই এই সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে। কারণ সন্ত্রাসী সে সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসীর কোন দল নেই। কোন প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয় না। দেশের মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত আলেম-ওলামা, ধর্মপালনকারী সাধারণ নাগরিক বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সন্দেহের বশবর্তি হয়ে একে অপরকে অভিযুক্ত করা প্রকৃত সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসবাদে সুযোগ করে দেয়ার নামান্তর। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে যার নূন্যতম পড়াশোনা আছে তিনি বুঝবেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতরা শান্তির পক্ষ নেয় এবং সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে। দুঃখের বিষয় হলো আজ সরকার সেই ইসলামের শিক্ষাকেই প্রতিহত করার অভিযানে নেমেছেন। পাঠ্য-পুস্তকে দেশের অধিকাংশ জনগণের অদর্শ ও চেতনা বিরোধী সিলেবাস প্রণয়ন করছেন। এতে করে ইসলামের খণ্ডিত জ্ঞানধারীরা বিপথগামী হচ্ছে। তাই আমরা মনে করি ধর্মহীন শিক্ষাব্যাবস্থা সন্ত্রাসবাদের অন্যতম কারণ। অতএব আমাদের দাবী-শান্তিপ্রিয়, আদর্শ ও দক্ষ জাতিগঠনে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমূখি ও সার্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

ভিন্নমত দমনে সরকারের অস্থির প্রবণতা, দেশ পরিচালনায় সরকারের একগুয়েমী বিরোধী নাগরিকদের উগ্রপন্থা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করবে। তাই সবাইকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশ পরিচালনার জন্য আমরা সরকার বাহাদুরের প্রতি আহবান জানাই।

কাশ্মীরসহ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর আগ্রাসন-নির্যাতন বিশ্বমানবতাকে ধংসস্তুপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘ, ওআইসি ও আরবলীগসহ বিশ্বসংস্থাগুলো স্বার্থকেন্দ্রীক কৌশুলী ভূমিকা পালন করছে। আমরা বিশ্ব নেতাদেরকে মানবতার পক্ষে কার্যকারী ভূমিকা নেয়ার আহবান জানাই।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবী মেনে নিন

-ইশা ছাত্র আন্দোলন

দেশ আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি অতিক্রান্ত করছে, দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন ক্ষমতাশীন ছাত্র সংগঠন এর ক্যাডাররা অস্থির করে রাখছে। যার ফলে ছাত্রদের সার্বিক শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হলের দাবীতে রাজপথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের হামলা পরিস্থিতি আরও বেশি ঘোলাটে করে তুলছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের ২৫ বছর পূর্তিতে আগামী ২৬ আগস্ট'১৬ শুক্রবার সকাল ৯টায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিতব্য পুনর্মিলনী সমাবেশ বাস্তবায়ন কমিটির এক জরুরি সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম আল-আমীন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে হলের ব্যবস্থা করুন।

তিনি আরও বলেন, ২৬ আগস্ট সারাদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে আসার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং সমাবেশে দেশী-বিদেশী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদগণ আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করতে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে পোস্টার-ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে। তাই তিনি ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করতে সকলের কাছে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

২৩ আগস্ট ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

২৩ আগস্ট ১৯৯১ সালের এই দিনে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এদশের মানুষের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা আপোষহীন

সিপাহসালার চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ)।

মাদক, সন্ত্রাস, অপসংস্কৃতি যখন দেশের যুব সমাজের জীবনে প্রবিষ্ট হচ্ছিল। ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ যখন মহামারী আকার ধারণ করছিল, ঠিক তখনই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল সংকট মোকাবেলার শপথ নিয়ে ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট, শুক্রবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন। ইতোমধ্যে ছাত্র আন্দোলন তার পথচলার ২৫ বছর সম্পন্ন করেছে। ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৬ আগস্ট ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। পঁচিশ বছরের সকল সাবেক-বর্তমান সদস্য ও দায়িত্বশীলদের মিলনমেলা হবে পুনর্মিলনী সমাবেশ।

এক যুক্ত বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি.এম. রুহুল আমীন ও সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ বলেন, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা আজো বাস্তবায়ন হয় নি। সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলদেরকে আবারো ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ করতে হবে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুনর্মিলনী সমাবেশ দিবস হবে সেই শপথ এবং দৃঢ় সংকল্পের দিন। নেতৃবৃন্দ বলেন, গত পঁচিশ বছরের পথ চলায় আমরা ছাত্র রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছি, সন্ত্রাসের অবসান ঘটিয়ে আদর্শভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির প্রবর্তন করেছি এবং ছাত্র সমাজের আদর্শ বিচ্ছিন্নতাজনিত ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসরণ এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ভয়ংকর সয়লাবকে রুখে দিয়েছি। অতএব প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসেব মিলিয়ে আগামী দিনের পথচলাকে সুগম ও শাণিত করবে এই পুনর্মিলনী সমাবেশ।

ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পুনর্মিলনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ইসলাম অনুসৃত না হওয়ার কারণেই দেশে ইনসাফ, সুবিচার ও সুশাসন কায়েম হচ্ছে না

পীর সাহেব চরমোনাই

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমীর মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাই বলেছেন, আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল ইসলাম। আজকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলাম অনুসৃত না হওয়ার কারণেই দেশে ইনসাফ, সুবিচার ও সুশাসন কায়েম হচ্ছে না। সমাজ আজকে নীতি-নৈতিকতাহীন, বস্তুতান্ত্রিক সফলতার চিন্তায় বিভোর। মানুষ বল্গাহীন দুর্নীতি, হত্যা, পাপাচার এবং দুরাচারে লিপ্ত হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাকে লুণ্ঠনের অধিকার মনে করছে। রাজনীতিকে সেবা নয়; বরং শোষণের হাতিয়ার বানিয়েছে। জাতি ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ছুটে চলছে। এই ধরণের সংকট মোকাবেলার জন্যই বাংলার মুজাদ্দিদ, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক রাহবার মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম (রহ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, দেশে বৃটিশপ্রবর্তিত শিক্ষার কারণে লাখো তরুণ ও যুব সমাজের ঈমান-আকিদা ধ্বংস হয়ে ভ্রান্ত মতবাদ ও নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। ছাত্র-রাজনীতি রাজনৈতিক দলসমূহের লেজুরভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদের ইমান-আকিদা রক্ষার জিম্মাদারী ইশা ছাত্র আন্দোলনের সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলদেরকে নিতে হবে। জাতির হাজার বছরের মুক্তির স্বপ্ন আপনাদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। তাই তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষাসহ ইসলামী শিক্ষার জ্ঞানে শিক্ষিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়াদী উদ্যানে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ইশা ছাত্র আন্দোলনের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীদের মহামিলনের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন। ২৫ বছর পূর্তি মহামিলন সমাবেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজার দায়িত্বশীল অংশ নেন। সকাল ৯টা থেকে সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ফজরের পর থেকেই দায়িত্বশীল এবং বর্তমান নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। পীর সাহেব চরমোনাইর বক্তব্যকালে মুহুর্মুহু শ্লোগানে প্রকম্পিত হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পরিবেশ।

কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীন-এর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ-এর সঞ্চালনায় পুনর্মিলনী সমাবেশে বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ (ভারত)-এর কার্যকরি কমিটির সভাপতি ও দারুল উলুম দেওবন্দ-এর সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা সালমান বিজনুরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল হক আজাদ, বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রিন্সিপাল সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানী, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর আমীর ড. ঈশা শাহেদী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর যুগ্ম মহাসচিব

অধ্যাপক এটিএম হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আল-ফরিদি, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, ইসলামী ঐক্য জোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা শেখ লোকমান হোসেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ খলিলুর রহমান, মাওলানা আহমাদ আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ, কে.এম আতিকুর রহমান প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন হাবিবুর রহমান কাসেমী, ড. আফম খালিদ হোসেন, মিযানুর রহমান সাঈদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক মুফতি এছহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ, রহমতে আলম কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক এবং সর্বদলীয় ইসলামী ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ।

পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিস্তার রোধে অবিলম্বে ধর্মহীন শিক্ষানীতি, ভিন্ন ধর্মতত্ত্বের পাঠ্যসূচি ও প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ২০১৬ অবিলম্বে বাতিল করে ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামিক স্কলারদের সাথে নিয়ে এগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। জঙ্গিবাদ বন্ধে, জঙ্গি কার্যক্রমের উস্কানিদাতা এবং অর্থদাতাদের চিহ্নিত করে ওদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী কওমি শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষা করতে হবে।

পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, এদেশের মুসলিম সন্তানেরা জ্ঞানের অভাবে এবং পশ্চিমা অপপ্রচারের কারণে ইসলামকে বাদ দিয়ে একদিকে কুফরী গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে। অপরদিকে ভ্রান্ত মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হচ্ছে জান্নাত পাওয়ার মিথ্যা আশায়। এ পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, স্বাধীনতার ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও মানুষ এর প্রকৃত স্বাদ আজো পায় নি। অথচ ইসলামকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। আর এজন্য সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতি পরিহার করে ছাত্রদেরকে আদর্শিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। একই সাথে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করতে হবে। আর এসব লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বশীলদের কর্তব্য থেকে অবসর নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, ইসলামের নামে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষ হত্যা করে ইসলামকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। এসব অপকর্মের স্থান ইসলামে নেই। এগুলো প্রতিহত করে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরার জিম্মাদারি গ্রহণ করতে হবে দায়িত্বশীলদের।

পীর সাহেব চরমোনাই তার ভাষণে বলেন, ভারতীয় পানি আগ্রাসনের শিকার হয়ে এদেশের মানুষ বন্যায় ও খরায় সর্বশান্ত হচ্ছে। দেশের বনসম্পদ ধ্বংস করে ভিনদেশী প্রভুর চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের বুক চিরে ট্রানজিটের নতজানু চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় দেশ ও জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন আজও এদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ভিনদেশি প্রভুরা। দেশে এখন বাকস্বাধীনতা নেই। ভোটের অধিকার নেই। এ অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যেই ১৯৭১ সালে এ জাতি চূড়ান্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই দেশের এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে নিরবে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ইসলাম-দেশ-জাতি ও মানবতার কল্যাণে সকলকে এগিয়ে এসে কার্যকর অবদান রাখতে হবে।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ইসলামী লোবাস ও দাড়ি-টুপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে এবং টুপি-দাড়িওয়ালাদেরকে বাঁকা চোখে দেখছে। মসজিদের খুতবা নিয়ন্ত্রণে অপচেষ্টা করছে। এত বড় নাফরমানি অতীতে কোন দিন হয় নি। বর্তমান শিক্ষানীতি ও পাঠ্য সিলেবাস জাসদের জঙ্গি ওরস্যালাইন, এটি জাতির জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, পীর সাহেব চরমোনাইর নেতৃত্বে দেশে কিছু করা সম্ভব। যতদিন এদেশে ইসলাম থাকবে ততদিন দেশে মুসলমান থাকবে। খুতবা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলাম ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। ইফার ডিজির মত খারাপ লোক ইতিহাসের নমরুদ-ফেরাউনও ছিল।

ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর প্রেসিডেন্ট শেখ শওকত হোসেন নিলু বলেন, বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করার অপপ্রচার চলছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। আজকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন কৈফিয়ত নাই। আমি আমার দল নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সাথে একসাথে থাকার ঘোষণা করলাম। তিনি পীর সাহেব চরমোনাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি আপনার কর্মী হিসেবে কাজ করব। আমার নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। তিনি ইসলামী আন্দোলনকে আগামী দিনে তৃতীয় শক্তির সম্ভাবনা বলে মন্তব্য করেন।

সমাবেশে কেন্দীয় সহ-সভাপতি জি. এম. রুহুল আমীন ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ঘোষণাপত্রে নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয় উল্লেখ করেন-

১. আজকের এই সমাবেশ থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন বিতর্কিত শিক্ষানীতি ২০১০, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ২০১৬ এবং সর্বস্তরের বাংলা পাঠ্যসূচি থেকে ইসলাম, দেশ ও স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী সকল বিষয়বস্তু প্রত্যাহার করে

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর বোধ-বিশ্বাসের আলোকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসের দাবি জানাচ্ছে।

২. এই সমাবেশ দেশের সকল উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে সেশনজট, আবাসন সংকট এবং সহিংস রাজনীতি উৎখাত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. এই সমাবেশ থেকে দেশে সুষ্ঠু ধারার রাজনীতির প্রচলন, ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে এবং যাবতীয় উগ্রবাদ ও চরমপন্থা থেকে ছাত্র-সমাজকে রক্ষা কল্পে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনতিবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালুর দাবি জানাচ্ছি।

৪. এই সমাবেশ দেশে মাদরাসার উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সকল জেলায় একটি করে আলিয়া মাদরাসা সরকারিকরণের দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি মাদরাসার ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে ভর্তির সমান সুযোগ দানের দাবি জানাচ্ছে।

৫. বাংলাদেশের বৃহৎ একটি অংশ কওমি মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। অথচ বিশাল এইশ্রেণিকে সরকার নানা টালবাহানা করে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এই সমাবেশ থেকে দেশের সকল কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তা বজায় রেখে সনদের সরকারি স্বীকৃতির জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. ধর্মহীন শিক্ষা জাতিকে কখনো আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারে না। এই সমাবেশ শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক কোরআনী শিক্ষা চালুরও দাবি জানাচ্ছে।

৭. প্রতিযোগিতার এ বিশ্ব বাজার দখল করতে দেশে আজ নারীদের বিভিন্ন পণ্যের মডেল হিসেবে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যার দরুণ নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিনিয়ত ক্ষুন্ন হচ্ছে, ধর্ষণের মত নানা অনাচার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমাবেশ নারীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে অশ্লীল উপস্থাপন বন্ধের জোর দাবি জানাচ্ছে।

৮. আমাদের এ মুসলিম জাতির রয়েছে স্বকীয় কৃষ্টি কালচার। কিন্তু আধুনিকতার নামে পশ্চিমা অশ্লীল কালচারে মুসলিম সংস্কৃতি আজ বিপন্নের মুখে। এ সমাবেশ সকল প্রকার অশ্লীল কৃষ্টি কালচার বন্ধের জোড়ালো দাবি জানাচ্ছে।

৯. দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির চর্চা না হলে কখনোই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং দেশ- জাতির উন্নয়ন কল্পে, সকল রাজনৈতিক দলকে সহিংস রাজনীতি পরিহার করে শান্তির পথে, জনগণের কল্যাণে অবদান রাখার জোর দাবি জানাচ্ছি।

১০. এই সমাবেশ দেশে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া গুলশান ও শোলাকিয়ার হামলাসহ সকল সন্ত্রাসী ও জঙ্গীদের কর্মতৎপরতার উৎস খোঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে।

জুমার নামাযের পর মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্নসিঁড়ি সাংস্কৃতিক ফোরাম, জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরব, আহ্বান, শিহরণসহ বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

পথশিশুদের মাঝে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর ঈদ বস্ত্র বিতরণ

৩০ জুন'১৬, বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এতিম, অসহায় ও পথশিশুদের মাঝে ঈদ বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইশা ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, পথশিশু বলে অবহেলার সুযোগ নেই। অন্যান্য শিশুদের মত তাদেরও মৌলিক অধিকার আছে। সুতরাং তাদের অধিকার রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। তিনি গরীব, অসহায় পথশিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিত্তবানদেরও আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি.এম রুহুল আমীন, সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল মুহা. আজিজুল হক, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. হাছিবুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এস. এম এমদাদুল্লাহ ফাহাদ, কেন্দ্রীয় স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদক মুহা. ইলিয়াস হাসান, কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক মুহা. মুস্তাকিম বিল্লাহ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহা. শরীফুল ইসলামসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অভিনন্দন জানিয়েছে

ইশা ছাত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি. এম. রুহুল আমীন ও সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ এইচ এস সি, আলিম ও সমমনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দন বার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন– যারা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের স্বপ্নলালন করছে যাতে তারা যেন দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আসন ও

শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ পায় তার নিশ্চয়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সন্ত্রাসবাদ আমাদের শিক্ষাঙ্গনের একটি মৌলিক সমস্যা। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংংগঠনের কোন্দল ও কোপানলের শিকার হয়ে যাতে কোন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবন হুমকির সম্মুখিন না হয়, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে।

মেধাবী ছাত্রদের আস্থার ঠিকানা ও আপামর ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইশা ছাত্র আন্দোলন ভাল ফলাফল অর্জন করায় সংশ্লিষ্ট মহলকে অভিনন্দন ও পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সার্বিক সফলতা ও উন্নতি কামনা করে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে সকলের প্রতি নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান। শিক্ষার্থীরা আগামীদিনে এ দেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও কল্যাণরাষ্ট্র গড়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

মালিবাগে মসজিদ রক্ষা আন্দোলনের কথা জাতি ভুলবে না

-ইশা ছাত্র আন্দোলন

১৪-০৮-১৬ইং রবিবার বিকাল ৫টায় বাইতুল আজিম শহীদি জামে মসজিদে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগর পূর্বের উদ্যেগে আয়োজিত মালিবাগ মসজিদ রক্ষার্থে চারশহীদের স্মরণে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলেপ্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল মু. আজিজুল হক, প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, শহীদ রেজাউল করীম ঢালী, শহীদ হাফেজ আবুল বাশার, শহীদ ইয়াহ্ইয়া, শহীদ জয়নাল আবেদীন এর রক্তে গড়ে উঠেছে বাইতুল আজিম শহীদি জামে মসজিদ। যারা সন্ত্রাসী হামলা করে তাজা চারটি প্রাণ নিয়েছিল তথাকথিত সেই ইসলামি মূল্যোবোধের গুন্ডাবাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আজো হয়নি। রক্তস্নাত কাফেলা ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের ২৫বছর পুর্তি উপলক্ষে ২৬ আগস্ট সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশ সফল করে শহীদদের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবীকে বেগবান করতে হবে। বিশেষ অতিথি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদক আলহাজ মুহাম্মাদ ফজলুল হক মৃধা বলেন, ইশাছাত্র আন্দোলন চার শহীদের হত্যা কারীদের বিচার না হওয়া বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আরো বিভৎসরূপে নিয়ে যাবে ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইশা ছাত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগর পূর্বের সভাপতি মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, নগর সহ সভাপতি মুহাম্মাদ তাজওয়ার হাসান, সাধারণ সম্পাদক সাইফ মুহাম্মাদ সালমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইখতিয়ার হুসাইন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ সোলাইমান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহাদী হাসান, মুহাম্মাদ জাহিদ, মুহাম্মাদ ইউনুছ আলী, মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান প্রমূখ।

৩৫টি নিউজ পোর্টাল বন্ধ করে দেয়া সরকারের বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ

-ইশা ছাত্র আন্দোলন

কোন পূর্ব নোটিশ ব্যতিত দেশের ৩৫টি ওয়েব পোর্টাল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমরা এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন। তথ্যমন্ত্রি হাসানুল হক ইনু বলেছেন জঙ্গী বিষয়ে উস্কানীমূলক খবর প্রচারের অভিযোগে এগুলো বন্ধ করা হয়েছে। অথচ নিউজ পোর্টালগুলোর কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে তাদের পোর্টলে উস্কানীমূলক কোন সংবাদ নেই।

সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা কর্তৃপক্ষকে বলবেন-ই না অথচ ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে ভুয়া অভিযোগে হত্যা করবেন, একটি স্বাধীন দেশে এটা কিভাবে সম্ভব?

গত ৬ আগস্ট'১৬ শনিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি.এম. রুহুল আমীন ও সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ এক যুক্ত বিবৃতিতে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মানুষের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়ার বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ থেকে বিরত থাকুন। গণমাধ্যমকে মানবতার পক্ষে কথা বলতে দিন। ভিন্নমত ও গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিণতি শুভ হবে না।

MAULANA SAYED FAZLUL KARIM RAH. WAS A GREAT POLITICAL AND ISPRITUAL PERSON

-MUFTY FAYZUL KARIM

Last Friday on 22 July'16, "Maulana Sayed Fazlul Karim Rah. Research Center "arranged a public lecture on political and spiritual philosophy of Sayed Fazlul Karim Rah.presided byNurul Islam Al-Amin (Chairman of Research Center) at central office of Islami Andolan Bangladesh, PuranaPalton , Dhaka.

In this program, Maulana Sayed Fayzul

Karim was presented as Chief Gest and Professor Mahbubur Rahman who is convener of National Teachers Forum and Maulana GaziAtaur Rahman who is JointSecretary General of Islami Andolan Bangladesh were invited as lecturer.

Maulana Fazlul Karim called for protesting liberation-sovereignty and revolted against illegal power. To prevent Muslims'' rights and honor, he claimed establishing Muslims' United Nation. Overall, he was a great political and spiritual person, said Mufty Fayzul Karim.

Sayed Fazlul Karim believed that spiritual knowledge is the best way for spiritual inner peace and to be merciful person to almighty Allah. He was representative of Sayed Eshaak Rah. Many people across the country got spiritual and political knowledge from him. To invite people to Islamic ideology, he visited rural area of Bangladesh with foreign country. He thought that without clearances in character, society and cultural a man never can be spiritual success. His theory is called "combination of spirituality and jihad. For this reason, he not only established political party, student organization and labor organization but established many Islamic institutions, said professor Mahbubur Rahman.

Gazi Ataur Rahman said, Maulana Sayed Fazlul Karim was a political editor. He wanted change leader's ideology, its mean "not only change the political leaders but change their ideologies 'for countries' welfare. This thinking made a great thinking revolution of political leaders. Many leaders are agreed to his political mission and vision. When making jostling with politics with Islam, he said ignorance of religious politics is way of illegal domination. He was alerted to make alliance with Islamic political party. His heart–felt inspiration helps many Islamic political partiesto establish Islamic movement and come in one platform and finally Islamic alliance was established. His target was making national alliance for Islamic revolution.

Director of this research center Sheikh Fazlul Karim Maruf, Assistant director S. M. Azizul Haq, managing director AHM Alauddin, Admin Director MD. Hasibul Islam, Training Director Sheikh Md.Saiful Islam and others were presented in public lecture.

যে উন্নয়ন জনগণের বিপক্ষে যায় তা কোনো উন্নয়নই নয়

-ইশা ছাত্র আন্দোলন

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারত লাভবান হবে এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে বিপর্যয় ঘটবে বাংলাদেশের। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চরম উদ্বেগ প্রকাশের পরও সুন্দরবনের পরিবেশকে হুমকির মধ্যে রেখে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। আওয়ামী সরকার পরিবেশ রক্ষার তকমা ও জনগণের পক্ষে কাজ করার ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় এসে কীভাবে পরিবেশ বিধ্বংসী এমন একটি প্রকল্প করার অনুমতি দিল তা আমাদের বুঝে আসে না?

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল-আমীন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি.এম রুহুল আমীন এবং সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ এর এক যৌথ বিবৃতিতে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প করলে পরিবেশের ক্ষতি হবেই। তবে এটা সুন্দরবনের কাছে হওয়ায় এখানে অন্য আরেকটি বিপদ আছে। তা হচ্ছে, ইতিমধ্যে প্রকল্পের আশপাশের জমি বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে। এসব জমিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে তা রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে ১০ গুণের বেশি ক্ষতি হবে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার এ ধন্যবাদ দেয়ায় আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, চুক্তিটি কি ভারতের স্বার্থে হচ্ছে?

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম "মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট"। এটি নির্মাণ করছে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটেড। গত মঙ্গলবার (১২ জুলাই'১৬) ঢাকার একটি হোটেলে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে ভারতের এক্সিম ব্যাংক।

ওই ব্যাংকের নীতি অনুসারে তারা সেসব প্রকল্পেই সহায়তা করে, যার মাধ্যমে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা থাকে। এ কারণে প্রশ্ন থেকে যায়, বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত কয়লা কি ভারত থেকে আমদানি করা হবে? নাকি বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর তা ভারতে রপ্তানি করা হবে?

এমতাবস্থায় আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও নিরপেক্ষ কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা চালানোর পর তা সুন্দরবন থেকে কোনো নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে নির্মাণ করতে হবে।

আল্লামা আবদুল হাই পাহাড়পুরীর ইন্তেকালে

ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর শোক প্রকাশ

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ) এর জামাতা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর ঢাকা মহানগরের সাবেক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, কারা নির্যাতিত নেতা মুফতি আশরাফুজ্জামান-এর পিতা শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল হাই পাহাড়পুরী ২৯ আগস্ট'১৬ সোমবার বিকাল ৩টায় খিলগাঁও আল খিদমাহ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় বাদ যোহর আইএবি মিলনায়তনে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির মাসিক বৈঠকে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

উক্ত দোয়ায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. নূরুল ইসলাম আল-আমীন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি.এম. রুহুল আমীন ও সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আল্লামা আবদুল হাই পাহাড়পুরী বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি। মরহুমের ইন্তেকালে দেশবাসী একজন বরেণ্য আলেমকে হারালো। মরহুমের ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করে দোয়া করা হয়।

দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলমী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল এস এম আজিজুল হক, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. হাছিবুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ মুহা. সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় তথ্য-গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক আ হ ম আলাউদ্দিন, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এস এম এমদাদুল্লাহ ফাহাদ, দফতর সম্পাদক মুহা. নোমান আহমেদ, মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল করীম আকরামসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

ইশা ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদকের পিতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস হাসান-এর পিতা মো. শাহ আলম হাওলাদার (৭৫) গত ২৫ জুলাই সোমবার, সকাল ৭টায় ঢাকায় পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় বাদ যোহর ইশা ছাত্র আন্দোলন এর ব্যবস্থাপনায় আইএবি মিলনায়তনে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. নূরুল ইসলাম আল-আমীন ও সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পৃথিবীতে আমরা কেউই চিরদিন থাকব না। একদিন সবাইকেই পরপারে চলে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় স্কুল ও কলেজ বিষয়ক সম্পাদক মুহা. ইলিয়াস হাসান অকালে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে হারিয়েছেন। পিতাকে হারিয়ে তাঁর পরিবারে আজ শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরহুমের ইন্তেকালে দোয়া মাহফিলে নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করে দোয়া করা হয়।

দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আশরাফ আলী আকন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি.এম রুহুল আমীন, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল এস এম আজিজুল হক, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. হাছিবুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ মুহা. সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় তথ্য-গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক আ হ ম আলাউদ্দিন, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এস এম এমদাদুল্লাহ ফাহাদ, দফতর সম্পাদক মুহা. নোমান আহমেদ, মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল করীম আকরাম, কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক মুহা. মুস্তাকিম বিল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহা. শরিফুল ইসলাম সহ কেন্দ্রীয় ও নগর নেতৃবৃন্দ।

শাখা সমাচার

নরসিংদী

গত ০৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন নরসিংদী জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম আল আমিন।

রংপুর জেলা ও মহানগর

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রংপুর জেলা ও মহানগর শাখার যৌথ উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা ও মহানগর আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক এইচ এম এমদাদুল্লাহ ফাহাদ।

ফেনী

গত ১৪ আগস্টরবিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি এম রুহুল আমিন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

লক্ষ্মীপুর

গত ১৫ আগস্ট সোমবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম।

চাঁদপুর

গত ১৫ আগস্ট সোমবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন চাঁদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম।

কুমিল্লা পশ্চিম

গত ১৪ আগস্ট রবিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কুমিল্লা পশ্চিম জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি এম রুহুল আমিন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

কুমিল্লা উত্তর

গত ১৪ আগস্ট রবিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কুমিল্লা উত্তর জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি এম রুহুল আমিন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

নারায়ণগঞ্জ

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন নারায়নগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহসভাপতি জি এম রুহুল আমিন এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম।

নরসিংদী

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন নরসিংদী জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহসভাপতি জি এম রুহুল আমিন এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম।

কক্সবাজার

গত ১৫ আগস্ট সোমবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কক্সবাজার শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহসভাপতি জি এম রুহুল আমীন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

খুলনা উত্তর ও দক্ষিণ

গত ১৭ আগস্ট বুধবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন খুলনা উত্তর ও দক্ষিণ জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর এর সভাপতি মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএবি, ঢা ম উ এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুল ইসলাম।

বাগেরহাট

গত ১৭ আগস্ট বুধবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন বাগেরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর এর সভাপতি মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএবি, ঢা ম উ এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুল ইসলাম।

হাটহাজারী

গত ১৫ আগস্ট সোমবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন হাটহাজারী শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জি এম রুহুল আমীন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ

সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

পটিয়া

গত ১৫ আগস্ট সোমবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন পটিয়া শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জি এম রুহুল আমীন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম মহানগর

গত ১৪ আগস্ট রবিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জি এম রুহুল আমীন ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

নোয়াখালী উত্তর ও দক্ষিণ

গত ১৫ আগস্ট সোমবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন নোয়াখালী উত্তর ও দক্ষিণ জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরিফুল ইসলাম।

বরিশাল জেলা ও মহানগর

গত ১৭ আগস্ট বুধবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন বরিশাল জেলা ও মহানগর শাখার যৌথ উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর এর সভাপতি মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএবি, ঢা ম উ এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুল ইসলাম।

ঝালকাঠী

গত ১৭ আগস্ট বুধবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ঝালকাঠী জেলা শাখা উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর এর সভাপতি মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএবি, ঢা ম উ এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুল ইসলাম।

পটুয়াখালী

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন পটুয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ফজলুল করীম মারুফ।

মুন্সীগঞ্জ

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক বরকতুল্লাহ লতিফ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল এস এম আজিজুল হক।

সিলেট জেলা ও মহানগর

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সিলেট জেলা ও মহানগর শাখার যৌথ উদ্যোগে পুনর্মিলনী সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে জেলা ও মহানগর আইএবি এবং সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম।

মাদারীপুর

গত ০৫ আগস্ট শনিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন মাদারীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম শাহিন এর সভাপতিত্বে শাখার তদারকি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম।

শরীয়তপুর

গত ০৫ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন শরিয়তপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ হযরত আলী এর সভাপতিত্বে শাখার তদারকি সভা অনষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম।

লক্ষীপুর

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন লক্ষীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাছিবুল ইসলাম।

ঢাকা মহানগর পূর্ব

গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি জহিরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয় এবং গত ১১ আগস্ট রিপোর্টিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুল ইসলাম, জয়েন্টসেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মাদ আজিজুল হক ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

সরকারী নাজিমউদ্দিন বি,কলেজ

গত ০৫ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সরকারী নাজিমউদ্দিন বি, কলেজ শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ জামিল হোসাইন এর সভাপতিত্বে শাখার তদারকি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুল ইসলাম ।

কুড়িগ্রাম

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কুড়িগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি শরীফুজ্জামান সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক এইচ এম এমদাদুল্লাহ ফাহাদ।

কিশোরগঞ্জ

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ রেদোয়ান ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক এইচ এম কাওছার আহমাদ।

ফেনী

গত ৪আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম হেলাল এর সভাপতিত্বে ইশা ছাত্র আন্দোলন সাবেক জেলা শাখার দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নোমান আহমাদ।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ

গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ এহতেশামুল হক পাঠান এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নোমান আহমাদ।

ঢাকা জেলা পশ্চিম

গত ০৫ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ঢাকা পশ্চিম জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আলমাস হোসাইন এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহবুব আলম।

মোমেনশাহী

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

মোমেনশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আবু রাসেল এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মুহাম্মাদ মাজহারুল ইসলাম।

নেত্রকোনা

গত ১৩ আগস্ট শনিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন নেত্রকোনা জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ লুৎফুর রহমান এর সভাপতিত্বে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও শাখার তদারকি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মুহাম্মাদ মাজহারুল ইসলাম।

পঞ্চগড়

গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন পঞ্চগড় জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি এস এম সুলতান মাহমুদ এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মুহাম্মাদ আল আমিন।

রাজশাহী

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রাজশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ ফিরোজ আলম এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ইহতেশামুল হক পাঠান।

চরমোনাই আলিয়া

গত ১৮-আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন চরমোনাই আলিয়া শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আল আমিন এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল।

চরমোনাই কওমীয়া

গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন চরমোনাই কওমীয়া শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য জি এম বায়েজিদ ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।

জামিয়াতুস সুন্নাহ মাদারীপুর

গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন জামিয়াতুস সুন্নাহ মাদারীপুর শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ ওসমান গনী এর সভাপতিত্বে দায়িত্বশীল তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য সাইফ মুহাম্মাদ সালমান।

সুনামগঞ্জ পূর্ব

গত ১৯ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সুনামগঞ্জ পূর্ব জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ইউসুফ আহমদ মানছুরী।

হাটহাজারী

গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন হাটহাজারী শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য রিদওয়ান

সুনামগঞ্জ পশ্চিম

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সুনামগঞ্জ পশ্চিম জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ নূর উদ্দিন এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ইউসুফ আহমদ মানছুরী।

ঢাকা জেলা উত্তর

গত ১২ আগস্ট শুক্রবার ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ঢাকা উত্তর জেলা শাখার উদ্যোগে শাখা সভাপতি সুলতান মাহমুদ এর সভাপতিত্বে কর্মী প্রত্যাশী তারবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর মুবাল্লীগ মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম।